জুলাই ২০২৫

বিজ্ঞানচিন্তা

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সুপারহিরোর বিজ্ঞান

সাক্ষাৎকার

এম এ আজিজ,
অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্ট ইথার এবং একটি ব্যর্থ পরীক্ষা

ইতিহাসের প্রাচীনতম মানচিত্রের নেপথ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সহজ পাঠ

বিজ্ঞান কল্পগল্প, রম্য ছড়া, কমিক, কার্যকারণ

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে
সিটি ব্যাংক™
Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

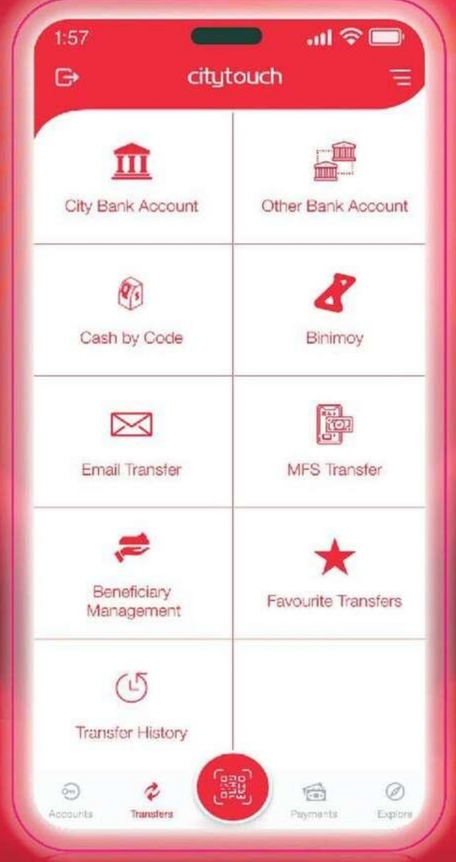
Job Solution BD
Click Here to join the Channel

citytouch
DIGITAL BANKING

city bank™ making sense of money

ব্যাংকিংয়ের সব এক অ্যাপেই সম্ভব

সকল ব্যাংকিং সেবার ওয়ানস্টপ সল্যুশন সিটিটাচ। ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংকিং করতে পারবেন মাত্র কয়েকটা ট্যাপেই। তাই আজই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর সিটিটাচ অ্যাপ ডাউনলোড করে উপভোগ করুন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা। ***সিটিটাচ হাতে, ব্যাংকিং সাথে সাথে।***



সিটিটাচ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

ডাউনলোড করুন
citytouch
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery
Available on the App Store

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



FCB&LTOPI/24

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

ENVOY TEXTILES LIMITED

- WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL
- FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY IN BANGLADESH
- FIRST ECO LAB IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH JEANOLOGIA
- 11-TIME WINNER OF NATIONAL EXPORT TROPHY
- WINNER OF NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD
- 3-TIME WINNER OF PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD
- MULTIPLE-TIME WINNER OF HIGHEST TAXPAYER AWARD
- 2-TIME WINNER OF HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD
- LAB ACCREDITATION BY RENOWNED BRANDS LIKE LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, JCREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET, etc.

amfori BSCI Trade with purpose
amfori BEPI Trade with purpose
OEKO TEX®
ROADMAP TO ZERO
GOTS - Global Organic Testing Standard
GRS - Global Recycled Standard
OCS - Organic Content Standard
RCS - Recycled Claim Standard
SOCIAL & LABOR CONVERGENCE
Investing in better cotton
COTTON USA™ THE COTTON THE WORLD TRUSTS
COTTON MADE IN AFRICA

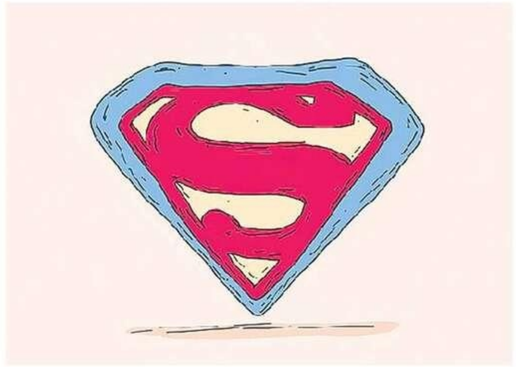
EXPORTING WORLDWIDE

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS · LEVI'S · KONTOOR · INDITEX · UNIQLO · target · BESTSELLER · H&M · J.CREW · C&A · Calvin Klein · COTTON:ON · Walmart · vf · TESCO · GAP · Carrefour · s.Oliver · LC WAIKIKI · JCPenney · next · Kmart · RALPH LAUREN · UNITED COLORS OF BENETTON.

www.envoytextiles.com

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সম্পাদকীয়



সুপারহিরো হতে সব সময় সুপারপাওয়ার লাগে না

১৯৩৮ সালে প্রথম সুপারহিরো হিসেবে কমিকস-জগতে শুরু হয় সুপারম্যানের পথচলা। ক্রিপ্টন গ্রহের এই অধিবাসী জয় করে নেয় পৃথিবীর লাখো-কোটি কিশোর-তরুণের মন। এর পর একে একে ব্যাটম্যান, ফ্ল্যাশ থেকে শুরু করে আয়রনম্যান, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, স্পাইডারম্যান ও হাল্কের মতো সুপারহিরোরা কমিকসের পাতা থেকে উঠে আসে বড় পর্দায়। তুমুল জনপ্রিয়তা পায় এই সুপারহিরোরা। এসব সুপারহিরোর আছে অতিমানবীয় ক্ষমতা—কেউ উড়তে পারে, কেউ ছুটতে পারে আলোর বেগে, কারও আবার আছে দুর্দান্ত সব প্রযুক্তি ও দারুণ সব স্যুট। এসব অতিমানবীয় ক্ষমতার কতটা বৈজ্ঞানিক আর কতটা শুধুই কল্পনা বা ফ্যান্টাসি? সুপারহিরোদের বিভিন্ন ক্ষমতা, প্রযুক্তি ও নেপথ্যের বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যা।

এককালে মানুষ ভাবত, আলো 'ইথার'-এর মধ্য দিয়ে চলে। আলবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মর্লি পরীক্ষা করে ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসখ্যাত এ পরীক্ষা নিয়ে থাকছে একটি বিস্তারিত লেখা। মানুষ প্রথম কেমন করে মানচিত্র বানাতে শিখলেন? জানতে পারবেন এ সংখ্যায়। জানতে পারবেন কোয়ান্টাম-জগতের বিচিত্র এক ঘটনা—জিনো ইফেক্ট নিয়ে। এ রকম আকর্ষণীয় সব ফিচারের পাশাপাশি মানুষের চন্দ্রজয় নিয়েও থাকছে একটি ইনফোগ্রাফ। ১৯৬৯ সালে প্রথম চাঁদে পা রাখেন মানুষ। সেই স্মরণীয় ঘটনা আরেকবার ফিরে দেখতে পারবেন পাঠক। পাশাপাশি প্রায় ৫০ বছর পর মানুষ যে চাঁদে ফিরতে চাইছেন, এ নিয়ে ধারাবাহিক কমিকসটি তো থাকছেই। সঙ্গে থাকছে কার্যকারণ, বিজ্ঞান রম্য, ছড়া, আইনস্টাইনের ধাঁধাসহ নিয়মিত সব আয়োজন।

ইতিহাসে সুপারপাওয়ার ছাড়াই বারবার বহু মানুষ নিজ সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ রকম সুপারহিরোরা বারবার এসেছেন, দাঁড়িয়েছেন মানুষের পাশে। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, সুপারহিরো হতে সব সময় সুপারপাওয়ার লাগে না। বাংলাদেশের ইতিহাসেও '৫২, '৭১ ও '২৪-এ এ রকম সুপারহিরোরা বারবার এসেছেন। তাঁরা আমাদের অনুপ্রেরণা। এই সংখ্যা আমরা তাঁদের উৎসর্গ করছি।

সবাই ভালো থাকবেন। শুভেচ্ছা।

বিজ্ঞানচিন্তা

জুলাই ২০২৫
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩২
বর্ষ ৯ সংখ্যা ১০
পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক
আব্দুল কাইয়ুম

উপদেষ্টা পরিষদ
ড. রেজাউর রহমান
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ
ড. আরশাদ মোমেন
ড. মাহবুব মজুমদার
মুনির হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
আবুল বাসার

সহসম্পাদক
উচ্ছ্বাস তৌসিফ
কাজী আকাশ

বিশেষ সহযোগী
রাজীব হাসান

সম্পাদনা দল
ইবরাহিম মুদ্দাসসের

ম্যাগাজিন সমন্বয়ক
শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. মহিউদ্দিন রওনক

শিল্প নির্দেশনা
সৈয়দ লতিফ হোসাইন

ডিজাইন
আপন জোয়ার্দার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

প্রচ্ছদ : এআই আর্ট

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে সহযোগিতায়
সিটি ব্যাংক™

প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : বিজ্ঞানচিন্তা, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।
ওয়েবসাইট : bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : facebook.com/Bigganchinta

পরিবেশক : প্রথমা
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

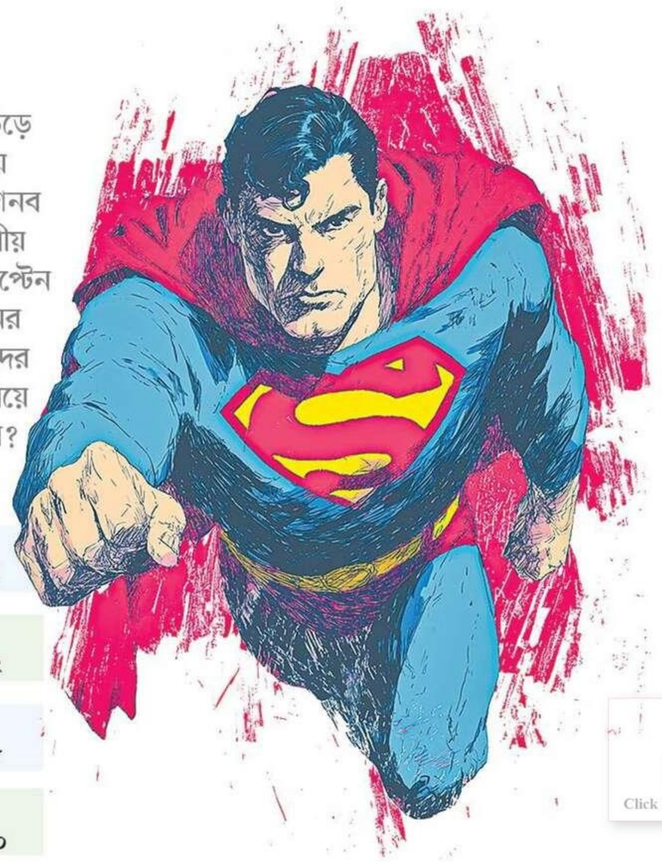
Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সূচিপত্র

মলাট কাহিনি

মহাকর্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি উড়ে বেড়াতে পারে সুপারম্যান। আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে ফ্ল্যাশ। রেগে গেলেই দানব 'হাল্ক' হয়ে ওঠে ব্রুস ব্যানার। অতিমানবীয় ক্ষমতায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় ক্যাপ্টেন আমেরিকা। ব্যাটম্যান আর আয়রনম্যানের মূল ক্ষমতা আবার প্রযুক্তি। সুপারহিরোদের এমন নানা রোমাঞ্চকর সুপারপাওয়ার নিয়ে বিজ্ঞান কী বলে? বাস্তবে কী এসব সম্ভব? সুপারহিরোদের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ...



বিজ্ঞানের চোখে ডিসির সুপারহিরোরা
ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী ১৪

মার্ভেল সুপারহিরোদের বিজ্ঞান
মৃণাল সাহা ২২

মার্ভেলের সুপারহিরোরা
শিবলী বিন সারওয়ার ২৮

তেজস্ক্রিয় সুপারহিরোরা
প্রদীপ দেব ৩০



বিজ্ঞান কল্পগল্প

ইকোন
দীপু মাহমুদ ৬৬

এথিন সামনে এগিয়ে গেল। রাগের আবেগ তৈরির চ্যানেল বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এথিন এগিয়ে যেতে পারল না। তার আগেই বিস্ফোরণ ঘটল। সেই বিস্ফোরণে এথিন ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে। পরীক্ষার জন্য যে পাঁচজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের পাওয়া গেছে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়।

বিজ্ঞান রম্য

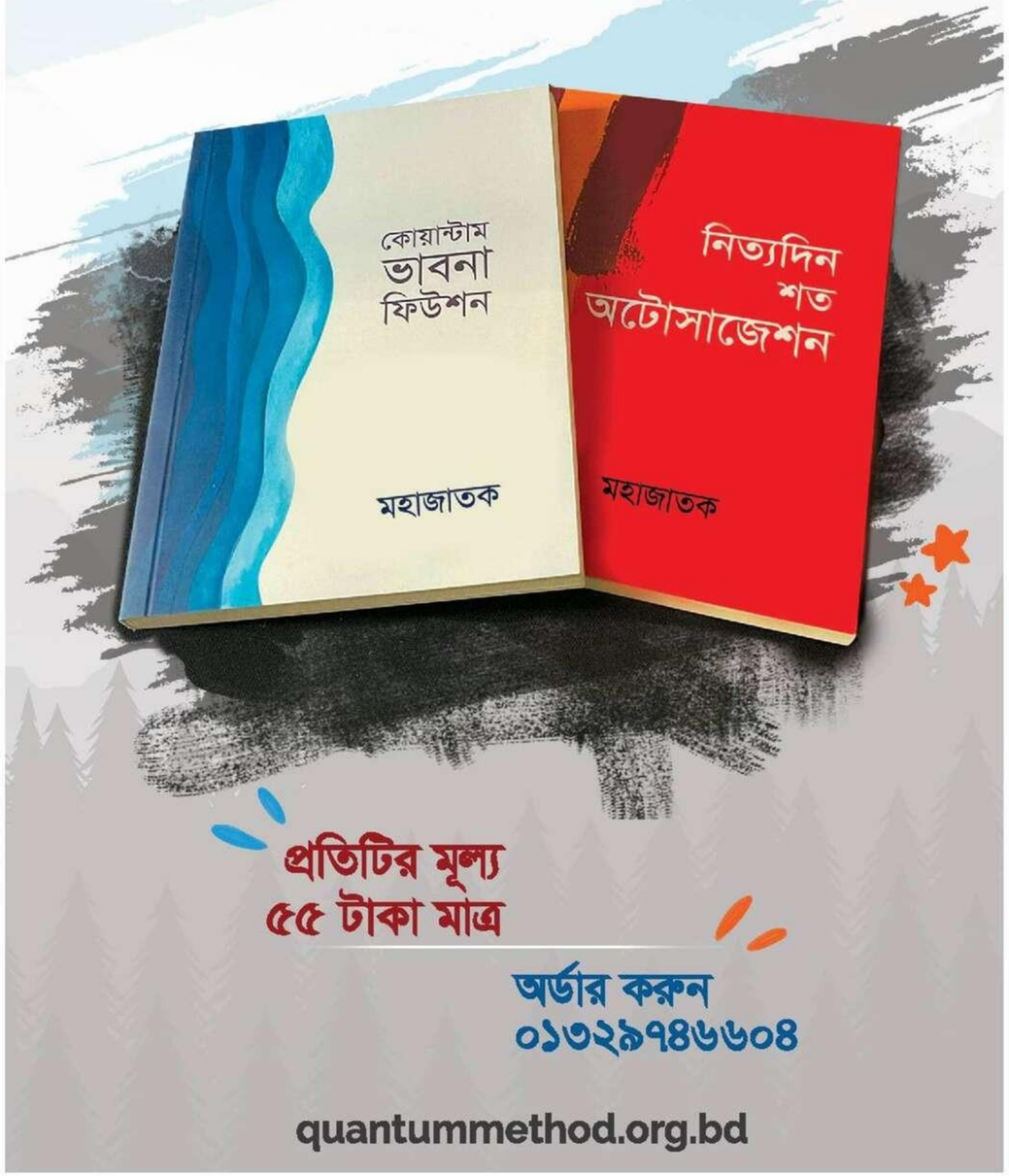


ইন্টারভ্যু
আহসান হাবীব ১১

বাজারে একটা কথা চালু আছে, আপনার আবিষ্কারটা এর আগেও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে গেছেন...

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সুখী সফল জীবনের শত সূত্র



প্রতিটির মূল্য
৫৫ টাকা মাত্র

অর্ডার করুন
০১৩২৯৭৪৬৬০৪

quantummethod.org.bd

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

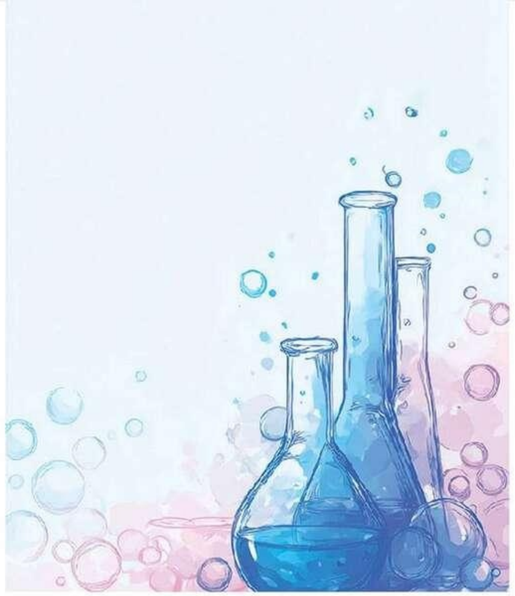
ফিচার

কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্ট
আবদুল গাফফার ৪৬

ইথার এবং একটি ব্যর্থ পরীক্ষা
আবুল বাসার ৪৮

ইতিহাসের প্রাচীনতম মানচিত্রের নেপথ্যে
উচ্ছ্বাস তৌসিফ ৫৪

রাসায়নিক বিক্রিয়া সহজ পাঠ : পর্ব ৪
রউফুল আলম ৬০





বিজ্ঞান কমিক
৩৪, ৩৬

সাক্ষাৎকার

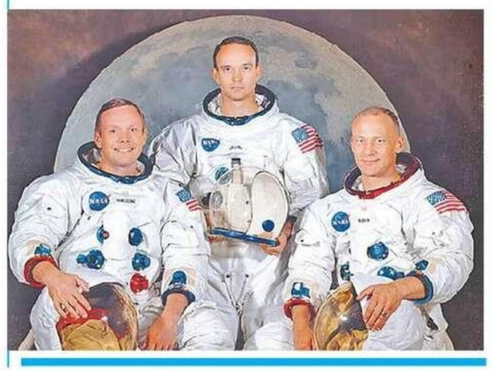


এম এ আজিজ
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৪০



রকমারি বিজ্ঞান

গগনে গগনে কী খেলা ৬২
মৌমাছি বনাম বোলতা ৬৪
অ্যাপোলো-১১-এর অ্যানাটমি ৭২



বিজ্ঞান ছড়া

কার্বোনেটেড ড্রিংক
শেখ সালাহউদ্দীন ১৩



নিয়মিত বিভাগ

ডাকবাক্স ৮
ছবিঘর ১২
বিজ্ঞানায়োজন ৩৯, ৫৭, ৬৯, ৭০
বইপত্র ৪৪
দুই চালে মাত ৪৫
গণিতের সমস্যা ৫২
আইনস্টাইনের ধাঁধা ৫৩
শব্দজট ৭০
বুদ্ধির ব্যায়াম ৭১
বিজ্ঞান প্রজেক্ট ৭৪
কার্যকারণ ৭৬
গোয়েন্দা ধাঁধা ৭৬
প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান ৭৭
সুডোকু ৭৭
গণিতের কুইজ ৭৮
কুইজ ৭৯

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

অন্যরকম প্রজন্ম উৎসব

অংশ নাও
সায়েন্স টপার ক্যাম্পেইনে



- বিজ্ঞানবাক্স থেকে বা তোমার পছন্দমতো যেকোনো সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করো।
- বর্ণনা সহ ভিডিও পোস্ট করো অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে।
- শুধুমাত্র এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখানোর পাশাপাশি কী শিখলে আর এই শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তাও বলতে পারো।

মাসের শেষে চার জন পাবে তার পছন্দের
বিজ্ঞানবাক্স উপহার



অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে যোগ দিতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করো

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে
মীনা বাজার · রকমারি.com
এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং
bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ডাকবাক্স

টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটি

সিঙ্গুলারিটি! কী অদ্ভুত সুন্দর এক নাম। নামটা প্রথম শুনেছি বিজ্ঞানচিন্তার কাছে। অবশ্য আগেও শুনেছিলাম। তবে সেটা ছিল ব্ল্যাকহোলের সিঙ্গুলারিটি বা পরমবিন্দু নিয়ে। টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটি নিয়ে এই প্রথম একটা ধারণা পেলাম। জানতে পেরে খুব ভালো লাগছে। বিজ্ঞানচিন্তা বরাবরের মতোই বিজ্ঞানের জগতে ঘটে চলা বিস্ময়কর জিনিসগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরছে এবং প্রতিবারই এগুলো পড়ে আমি মুগ্ধ হই। এমনিতে আমিও চাইছিলাম বিজ্ঞানচিন্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে সংখ্যা করা হোক। বিজ্ঞানচিন্তাকে অনেক ধন্যবাদ।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'পগনোলজি' শিরোনামের ছড়াটাও দারুণ লেগেছে। এককথায় অসাধারণ! গত সংখ্যায় দেওয়া 'হৃৎস্পন্দন মাপে কীভাবে' এবং 'শূন্য দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না কেন' লেখাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। এভাবেই আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিতে থাকো। তোমার সংখ্যাগুলো অনেক অসাধারণ হয়। ভালো থেকো।

নানজিব ফাহিম, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, কদমতলী, ঢাকা

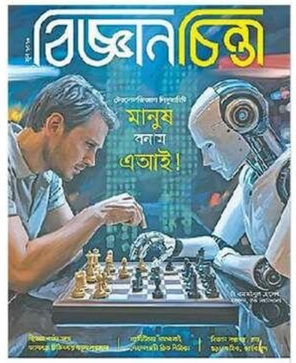
নানা বিষয় নিয়ে বৈচিত্র্যময় সংখ্যা চাই

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে!' এই সুবিশাল মহাবিশ্বে আমি যখন একা দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ দুচোখ মেলে অপার বিস্ময় আর সীমাহীন কৌতূহল সঙ্গী করে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি ওই নভোনীলের বিস্তৃত ক্যানভাসে, দুধসাদা ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়ানো কিছু নামহীন অজানা মহাজাগতিক রঙে রাঙানো কিংবা অপার্থিব আলোকসজ্জায় মহিমান্বিত হয়ে থাকা সেই এক্সট্রাঅর্ডিনারি মাস্টারপিসখানা আমাকে ভেতর থেকে পুরোপুরি নিঃস্ব করে ফেলে, আমাকে ছুড়ে ফেলে দেয় এক অচেনা ভুবনে, তখন মুগ্ধতায় রবি ঠাকুরের মতো ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছাড়া উপায় কই! বিস্ময় তো বটেই। সেই স্বপ্নময় নভোচারীই হোক বা কোনো ভাবুক কবি—সবাই বারবার মুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে যেতে চায়, সেই অতল গভীরে—আকাশজুড়ে জাদুময় স্রোতে হাস্যোজ্জ্বল আকাশগঙ্গায়। সেই মায়াময় আকাশগঙ্গাই যখন হয়ে ওঠে বিজ্ঞানচিন্তার কাগুজে প্রচ্ছদ, তখন সেই মুগ্ধতা আর স্রেফ দার্শনিকতায় পড়ে থাকে না, হয়ে ওঠে বিজ্ঞানমনস্ক মনের তুমুল জ্ঞানতৃষ্ণা।

এবারের সংখ্যায় তুমি যেন নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলে অসীম মহাশূন্যের অপারে—রহস্যময় মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ, মহাজাগতিক ঠিকানার খোঁজ, টেলিস্কোপ গায়ার দুর্দান্ত অভিযান, সুনিতা উইলিয়ামসের ভাষ্যে অবিশ্বাস্য চন্দ্রভ্রমণ থেকে শুরু করে কোয়ান্টাম-স্ট্রিং-প্ল্যাঙ্ক-নিউক্লিয়ার যুগলবন্দী। কিংবা *গেম অব থ্রোনস*-এর বন্যতা আর চ্যাটজিপিটির লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ—সব মিলে একদম জমজমাট আয়োজন। কোনোবারই তুমি আমাকে হতাশ করোনি—প্রতিটি সংখ্যায় তুমি ব্যাটে-বলে ছক্কা হাঁকিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়েছ। কী দারুণ ব্যাপার!

কিন্তু এবার থেকে পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি বায়োলজি, সাইকোলজি, আইসিটি কিংবা গণিতে (ইদানীং গণিতবিষয়ক বেশ কিছু কুইজ ছাপছ, বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন বলা যায়, তবে আরও উদ্যোগ দরকার) কাউকে আর হতাশ কোরো না, কেমন? বিজ্ঞানকে অযথা এককেন্দ্রিক না করে যত ডাইভার্স করবে, ততই আমরা বিজ্ঞানের সৌন্দর্যকে আরও আস্বাদন করতে পারব, তাই না?

বরাবরের মতো তোমার নতুন সংখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম। ভালো থেকো। বিজ্ঞানচিন্তার জয় হোক।



তূর্ণা দাশ, অষ্টম
শ্রেণি, পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা

আমি তোমার কাছে অনেক কিছু শিখেছি

আমি এক বছর ধরে বিজ্ঞানচিন্তা পড়ছি। আমার সৌরজগৎ, গ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্র নিয়ে আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। তাই মে মাসের 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি : আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা' সংখ্যাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করছি, ভবিষ্যতেও এ রকম মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরও সংখ্যা করবে। আমি তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বিজ্ঞানচিন্তা, তুমি এভাবে আরও এগিয়ে যাও।

বুশরা ইফফাত বিভা, বেঞ্চমার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, দত্তপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর

তোমার সঙ্গে শিগগিরই দেখা হচ্ছে

তোমার সঙ্গে পরিচয় অতি ক্ষণিকের। কয়েক মাস আগেও জানতাম না যে তুমি বিজ্ঞানচিন্তা নামক সব্যসাচী আছ। আমার বন্ধু জোবায়ের তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ও আমাকে বলল, তুমি নাকি অনেক ভালো বিজ্ঞান বোঝাও। বন্ধুর মুখে শুনে তোমাকে খুঁজতে বের হলাম লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিতে। পুরো কুড়িগ্রাম দশবার ঢুঁ মারলাম, কিন্তু তোমাকে পেলাম না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মানে, তোমার কথা প্রথম শুনেই প্রেমে পড়েছি।

আমার বন্ধু তোমার ফেসবুক আইডি পাঠিয়ে দিল। তোমার ফেসবুকে পোস্ট করা স্ট্যাটাসগুলোই পড়তে শুরু করলাম। তাতে তোমার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়তে থাকল। কিন্তু তোমাকে কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখা হলো না। তোমাকে ছুঁতে হলে যেতে হবে সুদূর রংপুরে। কারণ, কুড়িগ্রামের লাইব্রেরিগুলোয় বিজ্ঞানচিন্তা পাওয়া যায় না। পরে ভাবলাম তোমার একটু কাছে গিয়েই দেখি তুমি বাস্তবে কী রকম। তাই শুরু করতে যাচ্ছি তোমাকে নিয়ে ফোরাম। তোমাকে শুরু করতে আমি পদক্ষেপ নিয়েছি। তোমাকে ছুঁয়ে দেখার জন্য, তোমাকে নিয়ে কাজ করার জন্য সহযোগিতায় আছে তোমার অনেক আগের বন্ধু ইমরান ভাইয়া। তুমি অপেক্ষায় থাকো, তোমার সঙ্গে শিগগিরই দেখা হচ্ছে।

লাবিব মণ্ডল, দুর্গাপুর উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম গবেষক হতে চাই

আমি বিজ্ঞানচিন্তা জুন ২০২৫ সংখ্যাটি পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে লেখাগুলো। এই লেখাগুলো আমাকে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। এআই কীভাবে মানুষের চিন্তাভাবনার ধরন পাল্টে দিতে পারে, সেটা সহজ ভাষায় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আমি ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম গবেষক হতে চাই। তাই এ রকম লেখা আমার চলার পথ আরও উজ্জ্বল করে। বিজ্ঞানচিন্তা সব সময় এমন জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করে, যা ছাত্রদের জন্য অনেক সাহায্য করে। এ রকম লেখা যেন আরও প্রকাশিত হয়, সেই প্রত্যাশায় রইলাম।

দেবজীৎ ঘোষ প্রীতম, সপ্তম শ্রেণি, নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুর

নতুন ও সহজ এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে লেখা চাই

আপনাদের ম্যাগাজিন নিয়মিত পড়ি এবং প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত মজার বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য আমাকে খুব আনন্দ দেয় এবং জানাশোনা বাড়ায়। এ জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের দেওয়া মজার তথ্যগুলো শুধু বিনোদন দেয় না, বরং আমাদের আরও জানতে সহায়তা করে। আমি ছোট্ট একটা অনুরোধ করতে চাই, আপনারা যদি ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে নতুন ও সহজ এক্সপেরিমেন্ট বিষয়ে নিয়মিত লেখেন, তাহলে আমরা নিজেরা ঘরে বসে চেষ্টা করে শিখতে পারি। এতে আমাদের শেখা আরও বাস্তবমুখী ও মজাদার হবে।

আশা করি, আমার কথাটি বিবেচনা করবেন। আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল।

রমি এলিস, সপ্তম শ্রেণি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

তুমি উত্তর দিলে অনেক মজা হতো

প্রিয় বিজ্ঞানচিন্তা, বহুদিন হয়ে গেল, ভেবেছিলাম তোমায় কিছু লিখব। কিন্তু তা করা হয়ে ওঠেনি। তাই আজ সব উপেক্ষা করে লিখছি। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের এক বছর পূর্ণ হলো। আমি তো কিআও পড়ি। সেখানে আমি দেখেছি, সবার চিঠির নিচে কিআ ছোট্ট করে উত্তর দেয়। উফ্, তুমি উত্তর দিলে কী যে মজা হতো। এটা তো তোমার কাছে আমার প্রথম চিঠি, তাই প্লিজ, এটা ছেপে দিয়ো। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।

জান্নাতুল ফেরদৌস অধরা, ষষ্ঠ শ্রেণি, নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল, নারায়ণগঞ্জ

প্রতি মাসে বিজ্ঞানচিন্তার অপেক্ষায় থাকি

আমি তোমার খুব বেশি পুরোনো পাঠক নই। ২০২৫ সাল থেকে তোমাকে পড়া শুরু করেছি। এরপর থেকে বিজ্ঞানচিন্তাকে মনে হয় আমার সঙ্গী। আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে বিজ্ঞানচিন্তা হাতে নিয়ে দেখি ম্যাগাজিনটা গোয়েন্দা ধাঁধা, কুইজসহ নানা আয়োজনে সমৃদ্ধ। তোমাকে হাতে পেয়ে আনন্দে ভরে ওঠে আমার মন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আমি গড়ে তুলতে চাই বিশ্বজগতে। আর আমার সহায়ক বন্ধু হিসেবে কাজ করে আমার প্রিয় এই সঙ্গীটি। আমি এখন প্রতি মাসে বিজ্ঞানচিন্তার অপেক্ষায় থাকি। মাত্র অল্প কয়েক মাসেই বিজ্ঞানচিন্তা হয়ে গেল আমার প্রিয় সঙ্গী।

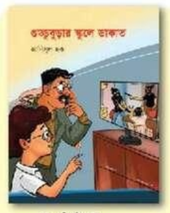
শীমা ইসলাম, চিলাহাটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী

আমাদের লিখুন

বিজ্ঞানচিন্তা
১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
ওয়েবসাইট : www.bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : fb/Bigganchinta

প্রথমা প্রকাশন
ছোটদের বই





আনিসুল হক
গুড্ডুবুড়ার স্কুলে ডাকাত
বাপরে, গুড্ডুবুড়া এবার ডাকাত ধরে ফেলল? কীভাবে?
৮ ১২৫

আহমেদ রিয়াজ
উল্টো পাহাড়
বাঘ হয়ে গেল খরগোশের সমান। তারপর কী হলো?



৮ ১২৫



তারিক মনজুর
কী ঢুকেছে রাজার পেটে
রাজার পেটে কী ঢুকে গেল! তারপর রাজা কী করলেন?
৮ ১২৫



খায়রুল বাবুই
কথা উড়ে যায়
কথা কি উড়ে যেতে পারে! কীভাবে?
৮ ১২৫

সাইদুজ্জামান রওশন
বাঘের পিঠে পিপিলা
পিপিলা কীভাবে বাঘের পিঠে উঠে বসল?

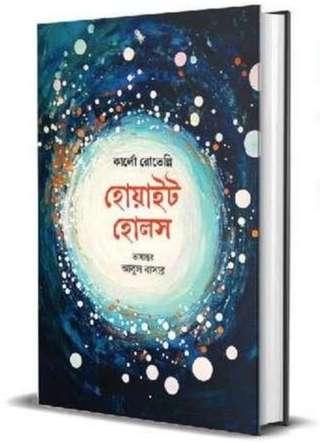


৮ ১৫০

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭
ঘরে বসে বই পেতে | www.prothoma.com | ০১৭৩০০০০৬১৯

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

প্রথমার বিজ্ঞান ও গণিতের বই



হোয়াইট হোলস

কার্লো রোভেল্লি

ভাষান্তর আবুল বাসার

নতুন বই

কৃষ্ণগহ্বরের ওপারে কী আছে? জবাব খুঁজতে এবার বৈজ্ঞানিক অভিযানে নেমেছেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কার্লো রোভেল্লি। এভাবেই খোঁজ পেয়েছেন মহাবিশ্বের আরেক রহস্যের—হোয়াইট হোল। যোগ দেবেন নাকি এই অভিযানে?

৳ ৩২০



আব্দুল কাইয়ুম
আরও গণিত আরও স্মার্ট ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩৪০
গণিত আর গণিত ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩২০
গণিতের জাদু ১৩তম মুদ্রণ। ৳ ৩২০

মুনির হাসান
প্রাথমিক গণিতের ভিত্তি ৯ম মুদ্রণ। ৳ ৪২০

রহমতউল্লাহ ইমন
গল্পে গল্পে পরিসংখ্যান ৫ম মুদ্রণ। ৳ ৩২০

নাফিস তিহাম
গণিত অলিম্পিয়াড ১০১ সমস্যা ও সমাধান ৮ম মুদ্রণ। ৳ ২৮০

কাজী আকাশ
গণিতের খেলা গণিতের মজা ২য় মুদ্রণ। ৳ ২৫০
ঝটপট গণিত ২য় মুদ্রণ। ৳ ৩০০

নাফিস তিহাম
সংকলন ও পরিমার্জন
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের যত প্রশ্ন ২য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০

প্রথমার আরও বই

আবুল বাসার
মহাজাগতিক প্রথম আলো ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৫২৫
আবিষ্কারের কাহিনি ৳ ৪০০

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী
এক্সোপ্ল্যানেট : বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে ৳ ৪২০

আহমাদ মোস্তফা কামাল
আমাদের মহাজাগতিক পরিচয় ৳ ২২০

দীপেন ভট্টাচার্য
আকাশ পর্যবেক্ষকের নোটবই ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩০০

ওয়াল্টার লুইন
ভাষান্তর : আবুল বাসার
ফর দ্য লাভ অব ফিজিকস ২য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০

স্টিভেন স্কট গাবসার।
অনুবাদ : আবুল বাসার
আ লিটল বুক অব স্ট্রিং থিওরি ৳ ৪২৫

স্টিফেন হকিং
অনুবাদ : আবুল বাসার
বড় প্রশ্ন ছোট উত্তর ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। ৳ ৩২৫
ব্ল্যাকহোল ৪র্থ মুদ্রণ। ৳ ২৪০

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড ম্লোডিনো
অনুবাদ : আবুল বাসার
দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন ২য় মুদ্রণ। ৳ ৪০০

ফ্র্যাঙ্ক ক্লোজ
অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ
অ্যান্টিম্যাটার ৪র্থ মুদ্রণ। ৳ ৩৫০

পিটার অ্যাটকিনস।
অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ
রসায়ন : সহজ পাঠ ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩০০

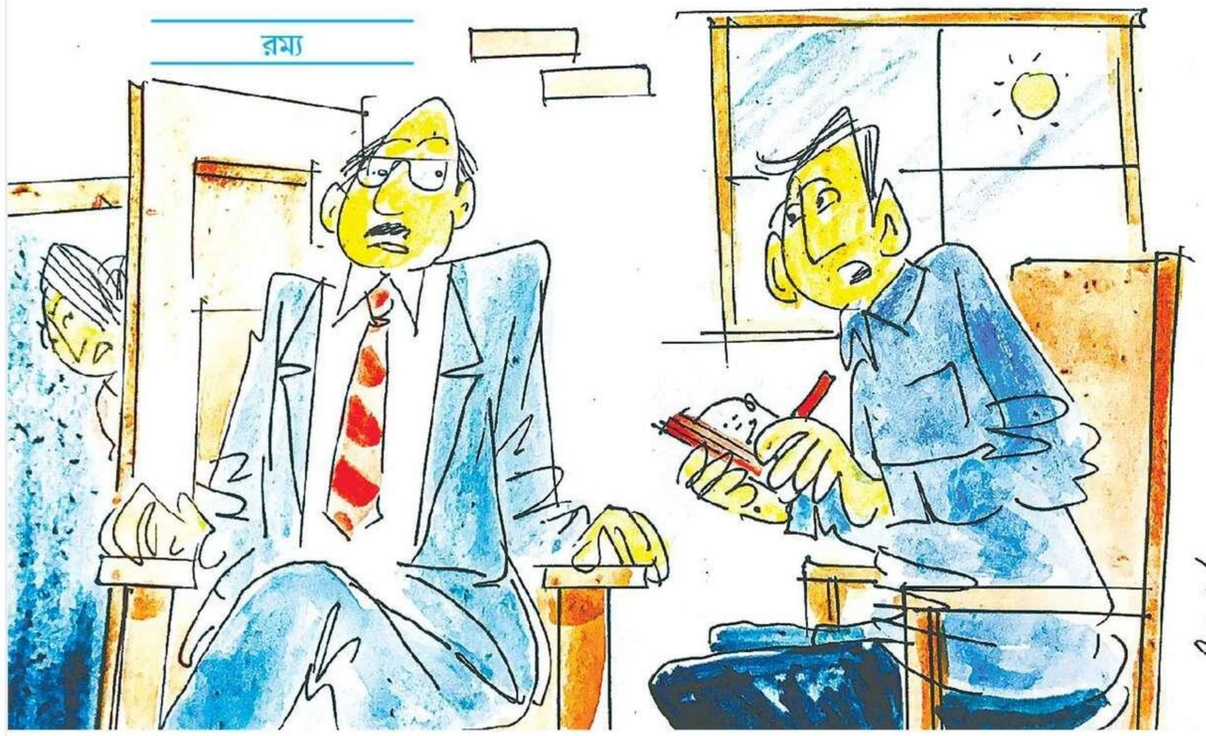
পল ডেভিস।
অনুবাদ : আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩০০

প্রথমা প্রকাশন

ঢাকা : ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭ ● ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬ ● শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬০০ ● মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬৪৮ ● সিলেট : ইউনিমার্ট বিল্ডিং, আম্বরখানা, সিলেট। ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

Job Solution BD Click Here to join the Channel



ইন্টারভ্যু

আহসান হাবীব

বাজারে একটা কথা চালু আছে, আপনার আবিষ্কারটা এর আগেও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে গেছেন

এক বিজ্ঞানীর ইন্টারভ্যু করতে গেছে এক সাংবাদিক।

—আচ্ছা, একজন সফল বিজ্ঞানী হতে গেলে কী কী গুণ থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

—তিনটা জিনিস থাকতে হবে।

—কোন তিনটা?

—জ্ঞান, সততা আর বুদ্ধিমত্তা।

—ওহ্ দারুণ! জ্ঞান তো থাকতেই হবে, তবে সততা আর বুদ্ধিমত্তা কেন? মানে যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন।

—সততা হচ্ছে কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে, তা সততার সঙ্গে পালন করতে হবে।

—আর বুদ্ধিমত্তা?

—বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে কাউকে কখনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না।

সাংবাদিক এবার অন্য লাইনে গেলেন।

—আচ্ছা, আপনার পারিবারিক জীবন নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

—বলুন।

—স্যার, টিভি দেখেন?

—হ্যাঁ, দেখি।

—তা টিভির রিমোট কার হাতে থাকে?

—কেন, আমার হাতে...তবে...

—তবে?

—তবে কোন চ্যানেল দেখব, সেটা অবশ্য আমার মিসেস ঠিক করে দেয়!

দান দান তিন দান। সাংবাদিকের শেষ প্রশ্ন।

—স্যার, আমার শেষ প্রশ্নটা আপনার সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিয়ে।

—কী প্রশ্ন?

—বাজারে একটা কথা চালু আছে, আপনার আবিষ্কারটা এর আগেও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে গেছেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

—হুম (দীর্ঘশ্বাস), ইয়ে...আপনার প্রশ্নটা এর আগেও কয়েকজন করে গেছেন...!

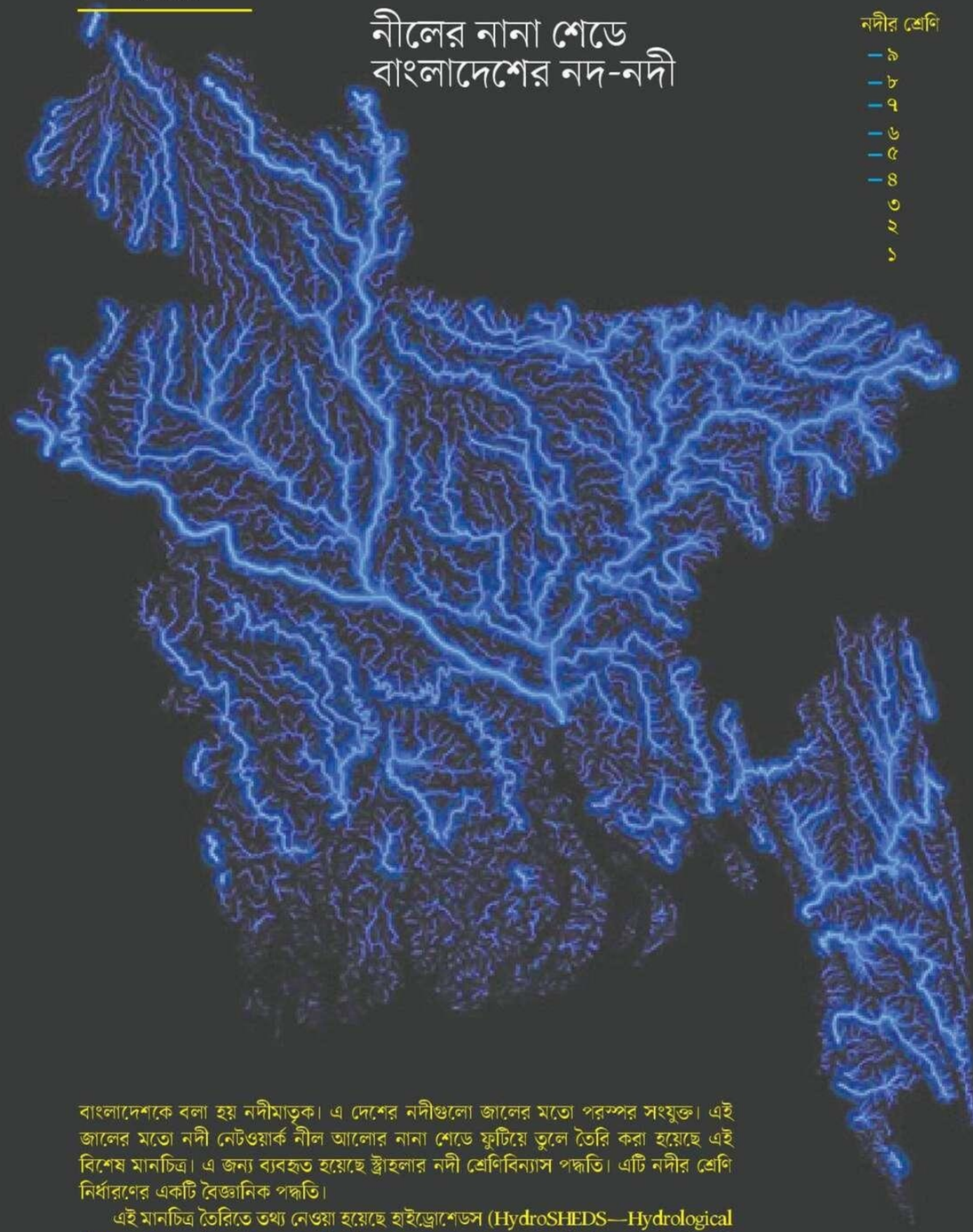
লেখক : রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট; সম্পাদক, উন্মাদ

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ছবিঘর

নীলের নানা শেডে বাংলাদেশের নদ-নদী



বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক। এ দেশের নদীগুলো জালের মতো পরস্পর সংযুক্ত। এই জালের মতো নদী নেটওয়ার্ক নীল আলোর নানা শেডে ফুটিয়ে তুলে তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ মানচিত্র। এ জন্য ব্যবহৃত হয়েছে স্ট্রাহলার নদী শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি। এটি নদীর শ্রেণি নির্ধারণের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এই মানচিত্র তৈরিতে তথ্য নেওয়া হয়েছে হাইড্রোশেডস (HydroSHEDS—Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales) ডেটাসেট থেকে । আর্কজিস প্রো নামের একটি ভূতাত্ত্বিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নদীগুলোর শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে (১ থেকে ৯ পর্যন্ত)। এরপর রঙের বিভিন্ন তীব্রতার মাধ্যমে এগুলোকে নান্দনিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থবহ ভিজ্যুয়াল এই মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কোনগুলো ছোট নদী (১ম শ্রেণি) আর কোনগুলো প্রধান নদী (৯ম শ্রেণি)। এই মানচিত্র শুধু নান্দনিকই নয়, পরিবেশ, নদীব্যবস্থাপনা এবং জলসম্পদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বাংলাদেশে নদীসংক্রান্ত গবেষণা, পরিকল্পনা ও শিক্ষায়।

মানচিত্র তৈরি ও লেখা :
বিশাল চাকলাদার স্বাধীন
কৃতজ্ঞতা : হাইড্রোশেডস ডট অর্গ
ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম : আর্কজিস প্রো

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ছড়া

কার্বোনেটেড ড্রিংক

শেখ সালাহ্‌উদ্দীন

কখনো কি পান করেছ 'কার্বোনেটেড' ড্রিংক?
জবাব দেওয়ার আগে একটু ভাবো, মানে—থিঙ্ক!
'পান করা তো দূরের কথা—দেখিওনি চেখে'
এমন কথা মনে মনে ভাবছ বলো কে কে?
এবার বলো খাওনি কে কে কখনো কোল্ড ড্রিংক
রং—বাদামি, কমলা, স্বচ্ছ, হলুদ, লাল বা পিঙ্ক!
চিনলে তো ঠিক! সুযোগ পেলেই হামেশা যা খাচ্ছ
খেতে খেতে ফুর্তিতে কেউ কখনোবা নাচছ।

দেশে দেশে আছে এদের হরেক রকম নাম
সেসব থেকে অল্প কিছু আমি জানালাম—
ফিজি, লিমো, সোডা, জুসু আরও কত-কী
রিফ্রেসকো, পপ, বুয়াসম গ্যাজুজ, রেফ্রিজারেন্টি।

খুললে তুমি বোতল বা ক্যান এরা করে ফোঁস
উপচে পড়ে, ভাবো এতে তোমার বুঝি দোষ।
কার্বন ডাই-অক্সাইড এতে থাকে দ্রবীভূত
খুলতে গেলেই গ্যাস-পানীয় বেরোতে চায় দ্রুত
শব্দটা হয়—দ্রুত এ গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে
গ্যাসের চাপই দায়ী এতে—বিজ্ঞান এমন বলে।

বলছি এসব ড্রিংকে আরও থাকতে পারে যা যা
রাখতে একে লোভনীয়, সুস্বাদু ও তাজা—
পানি হলো এসব ড্রিংকের প্রধান উপাদান
পাঁচ-ছয় চামচ এক বোতলে চিনির পরিমাণ;
কোল্ড ড্রিংক থেকে প্রাপ্ত শক্তির হিসাব যদি করি
চিনি থেকেই আসে এতে সিংহভাগ ক্যালরি।
ফসফরিক বা সাইট্রিক অ্যাসিড ড্রিংকে অল্প থাকে
ঝাঁজালো বা টকের স্বাদটা এরাই বজায় রাখে।

কিছু ড্রিংকে ক্যাফেইনও অল্প পরিমাণে
থাকে; ত্বরিত দেহমনে চাঙা ভাব সে আনে।
আর কী থাকে—ফুড কালার ও গন্ধ উপাদান
বর্ণে-স্বাদে এরা বাড়ায় গুণগত মান।

সবার কাছে এসব বস্তু কেন এত প্রিয়?
ভাবছ খুবই উপকারী তবে এই পানীয়।
খুলেই বলি—সত্যিকারে ব্যাপারটা ঠিক তা না
ক্ষতিকারক দিকগুলোও উচিত তোমার জানা।

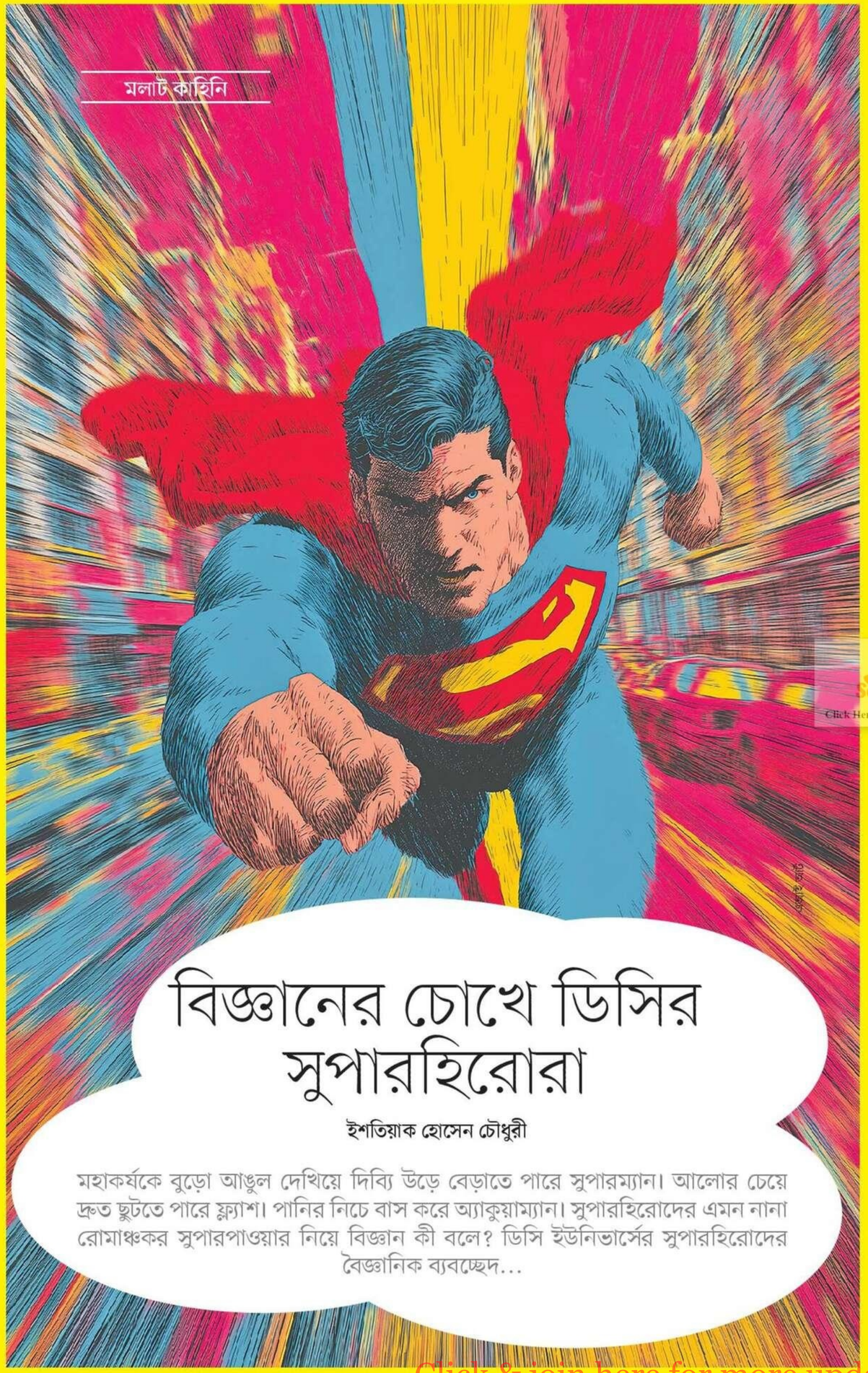
একনাগাড়ে অনেক কথা হয়ে গেছে বলা
বলতে বলতে আমার দেখি শুকিয়ে কাঠ গলা
বাকি তথ্য নাও না জেনে গুগল এআই ঘেঁটে!
এই ফাঁকে ড্রিংক একটুখানি চালান করি পেটে।

অলংকরণ : রাকিব



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



বিজ্ঞানের চোখে ডিসির সুপারহিরোরা

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী

মহাকর্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি উড়ে বেড়াতে পারে সুপারম্যান। আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে ফ্ল্যাশ। পানির নিচে বাস করে অ্যাকুয়াম্যান। সুপারহিরোদের এমন নানা রোমাঞ্চকর সুপারপাওয়ার নিয়ে বিজ্ঞান কী বলে? ডিসি ইউনিভার্সের সুপারহিরোদের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ...

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

সুপারহিরো কমিকস হোক বা মুভি, কাঠখোট্টা বিজ্ঞানকে নতুন রূপে উপস্থাপন করতে এদের জুড়ি নেই। আবার সঠিক প্রশ্ন ও গভীর চিন্তার মাধ্যমে এই আপাতবিনোদনের সূত্র ধরে মহাবিশ্বের নানান রহস্যের নাগাল পাওয়াও সম্ভব। সুপারহিরোদের রোমাঞ্চকর অভিযানে বিজ্ঞানের এ ধরনের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত কমিক বইগুলোতে। এই সময়কে বলা হয় কমিক বইয়ের ইতিহাসের 'রৌপ্যযুগ'। সিলভার এজ। স্বর্ণযুগে (১৯৩৮-৫৬) এসব কমিকসে বিজ্ঞানের রেফারেন্স তেমন ছিল না। ফলে মনোবিদ, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদদের প্রবল আপত্তির মুখে পড়ে এগুলো। সেই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় সুপারহিরোদের বৈজ্ঞানিক যাত্রা। আর হাল আমলের মুভিগুলোতে সুপারহিরোদের প্রতিটি কাজের পেছনেই আছে একধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, তা খাঁটি বিজ্ঞানীরা এগুলোকে 'অপব্যাখ্যা'ও বলতে পারেন বৈকি!

এ লেখায় ডিসি কমিকসের এ রকমই কিছু সুপারহিরোর সুপারপাওয়ারের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নিয়ে আলাপ করব। শুরুটা করব বুলেটের চেয়েও দ্রুতগামী, লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের চেয়েও শক্তিশালী এবং একলাফে আকাশচুম্বী দালান পেরিয়ে যাওয়া আমাদের সবার প্রিয় 'হিরোদের হিরো'র গল্প থেকে। সে আর কেউ নয়, আমাদের সবার প্রিয় সুপারম্যান!

২.

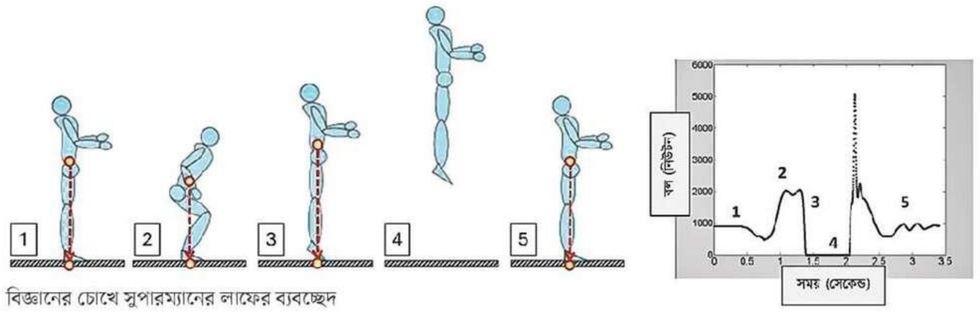
সুপারম্যানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। কিন্তু প্রথম দিকে প্রকাশিত কমিক বইগুলোতে সুপারম্যানের ওড়ার ক্ষমতা ছিল না। তখন সে একলাফে উঁচু উঁচু বাড়িঘর পেরোতে পারত। প্রতি লাফে প্রায় ২০০ মিটার উচ্চতায় উঠে যেত, যা ৫০ তলা দালানের চেয়েও বেশি উঁচু। এ জন্য সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পায়ের পেশির মাধ্যমে মাটিতে বল প্রয়োগ করে লাফ দিত ওপরের দিকে। নিউটনের গতিসূত্রগুলো থেকে হিসাব কষে দেখা যায়, সুপারম্যানের শুরুর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ৬২ মিটার হলেই কেবল এমনটা ঘটা সম্ভব। প্রশ্ন হলো, সুপারম্যানের মতো অতিমানবের (বলা ভালো এলিয়েন) পক্ষেও কি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে এত বেশি বেগ অর্জন করা সম্ভব?

সুপারম্যানের লাফ দেওয়ার কৌশল অন্য যেকোনো সাধারণ মানুষের মতোই। প্রথমে সে অল্প সময়ের জন্য হাঁটু ভাঁজ করে নিচে বসে পড়ার মতো ভঙ্গি করে। তারপর পা দিয়ে মাটিতে প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে মাটিও সুপারম্যানের প্রয়োগ করা বলের সমান বল বিপরীত দিকে প্রয়োগ করে। এর ধাক্কায় সে ক্রমে উঁচুতে উঠতে শুরু করে। পুরো ব্যাপারটা অনেকটা রকেট উড্ডয়নের মতো। কমিক বই অনুসারে, পায়ের পেশি দিয়ে মাটিতে বল প্রয়োগের সময়কাল মাত্র ০.২৫ সেকেন্ডের কাছাকাছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে সুপারম্যান যদি তার বেগ শূন্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৬২ মিটারে উন্নীত করার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে চায়, তাহলে ত্বরণের মান হতে হবে ২৪৮ মিটার/সেকেন্ড^2। এটি সাধারণ কোনো গাড়ির বেগ মাত্র ০.১ সেকেন্ডে শূন্য থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মাইলে নিয়ে আসার সমতুল্য! আমরা যদি সুপারম্যানের ভর ধরে নিই ১০০ কেজি, তাহলে একলাফে ২০০ মিটার পেরোনোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির মান হবে ২৪,৮০০ নিউটন ($F=ma$ ব্যবহার করে)।

প্রাপ্ত বলের মান কিন্তু বেশ উচ্চ মাত্রার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, সুপারম্যানের পায়ের পেশির পক্ষে কি এই পরিমাণ বল তৈরি করা সম্ভব? আমরা জানি, সুপারম্যানের হোম প্ল্যানেটের নাম 'ক্রিপ্টন'। কমিক বই অনুসারে, এর আকার পৃথিবীর চেয়ে বড়। সেখানে মহাকর্ষের মানও পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মেই ক্রিপ্টনের অধিবাসীরা বেশি মহাকর্ষে অভ্যস্ত। ফলে তাদের দৈহিক সক্ষমতাও পৃথিবীবাসীর চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার কথা। এসব বিবেচনায়, এত অল্প সময়ে বিশাল পরিমাণ বল প্রয়োগের সক্ষমতা মোটেও অবাস্তব নয়।

একজন মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়ালে সে মাটিতে তার ওজনের সমান বল প্রয়োগ করে। আর লাফ দেওয়ার সময় সাধারণত ওজনের দ্বিগুণ বা তার বেশি বল প্রয়োগ করে মাটিতে (ছবি দেখুন)। সুপারম্যানের বেলাতেও যদি এমনটা হয়, তার প্রয়োগ করা ২৪,৮০০ নিউটন বলের ঠিক অর্ধেক পরিমাণ—১২,৪০০ নিউটন হবে সুপারম্যানের ওজন। তবে সে যে পৃথিবীর মানুষের মতো দ্বিগুণ বল প্রয়োগ করবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কমবেশি হতেই পারে। তাই সতর্কতার অংশ হিসেবে আমরা যদি সুপারম্যানের সক্ষমতা কমিয়ে ধরি—ওজনের সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত বল, তাহলে তার ওজন দাঁড়াবে ১৪,৬০০ নিউটন।

ভালো কথা, ওজনের এই মান কিন্তু পৃথিবী নয়; বরং ক্রিপ্টন গ্রহের জন্য। সুপারম্যান মানুষের মতো দেখতে হলেও আদতে সে এলিয়েন। তাই তার শারীরিক সক্ষমতা বিচার করতে হবে তারই গ্রহের তুলনায়। যা-ই হোক, আলোচনার শুরুতেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম, সুপারম্যানের ভর ১০০ কেজি। মহাবিশ্বের সর্বত্র এটি একই থাকবে। অন্যদিকে ক্রিপ্টনের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর তুলনায় কমবেশি হবে। ওজনের গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে ক্রিপ্টনের অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পাওয়া যাবে ১৪৬ মিটার/সেকেন্ড^2। অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশি। দৈহিক সক্ষমতার পাশাপাশি এই বিশাল তারতম্যের কারণেই সুপারম্যান পৃথিবীর মাটিতে এত উঁচু লাফ



বিজ্ঞানের চোখে সুপারম্যানের লাফের ব্যবচ্ছেদ

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

দিতে পারে। আমরা পৃথিবীবাসীও কিন্তু চাইলে চাঁদে গিয়ে সুপারম্যান হতে পারি! নিদেনপক্ষে একলাফে পাড়ি দিতে পারি অনেকটা পথ। কারণ, সেখানকার অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বেশ খানিকটা কম।

প্রিয় পাঠক, দেখলেন তো, কীভাবে সুপারম্যানের লাফের প্রারম্ভিক বেগ পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা একটি অজানা এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণ পর্যন্ত বের করে ফেললাম। এরপরও কি আপনারা বলবেন, কমিক বই থেকে ফিজিকস শেখা যায় না?

৩.

প্রথম দিকে প্রকাশিত কমিক বইগুলোতে ক্রিপ্টন সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। শুধু ভারসাম্যহীন কোর-বিশিষ্ট পৃথিবীসদৃশ গ্রহ হিসেবে একে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পৌঁছে গেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তবে সেই গ্রহের বাসিন্দারা জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষের তুলনায় অনেক এগিয়ে। পরে ধীরে ধীরে সুপারম্যানের গল্পের পরিধি বাড়তে থাকে। একসময় 'ম্যান অব স্টিল'-এর মূল গল্পে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয় ক্রিপ্টন। সুপারম্যানের নানান অতিমানবীয় ক্ষমতা, যেমন সুপার স্ট্রেংথ, ফ্লাইং, ইনভালনারেবিলিটি ইত্যাদির ব্যাখ্যায়ও গ্রহটি ও এটির মূল নক্ষত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রথমে সুপার স্ট্রেংথ বা অতিমানবীয় শক্তির কথাই ভাবুন। ডিসি কমিক ইউনিভার্সের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারহিরো হিসেবে বিবেচনা করা হয় সুপারম্যানকে। কমিক বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন গল্প অনুসারে, সে এক হাতেই তুলে ফেলতে পারে ২০০ কুইন্টিলিয়ন টন ভর। এক ঘুষিতে ধ্বংস করে দিতে পারে গোটা উপগ্রহ। এমনকি হাতের মুঠোয় ধারণ করতে পারে ব্ল্যাকহোলের শক্তি। একবার তো সুপারম্যান হাঁচি দিয়েই দুর্ঘটনাক্রমে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল গোটা এক সৌরজগতের! বলা বাহুল্য, এসবের অধিকাংশই কাল্পনিক এবং বাস্তবে পুরোপুরি অসম্ভব। তবে পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তার অনেকখানি বেশি শক্তি ধারণ করার বিষয়টি বিজ্ঞানের নিরিখে কিছুটা হলেও ব্যাখ্যা করা যায়।

এলিয়েন হিসেবে সুপারম্যানের শারীরতত্ত্বও বেশ আলাদা। তার দেহের কোষগুলো নক্ষত্র থেকে আসা আলো থেকে সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। ক্রিপ্টন গ্রহটির মূল নক্ষত্র 'রাও' লাল বামন শ্রেণির। আমাদের সৌরজগতের নিকটতম লাল বামন নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টাউরির সঙ্গে তুলনা করে ধরে নেওয়া যায়, এর ব্যাসার্ধ আনুমানিক প্রায় ১০ লাখ কিলোমিটার। আর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তিন হাজার কেলভিনের কাছাকাছি। তাহলে নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্যের হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে নির্গত আলোর পরিমাণ (অর্থাৎ আলোক উৎসটি কতটা শক্তিশালী) হবে প্রায় ৬.৬×১০^{২৬} ওয়াট।

আমাদের সূর্য বামন নক্ষত্র নয়। এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৫,৮০০ কেলভিন এবং ঔজ্জ্বল্যের মান প্রায় ৩.৯১×১০^{২৬} ওয়াট। অর্থাৎ রাওয়ের তুলনায় ৫০০ গুণের বেশি! এই বাড়তি শক্তিটুকুই হতে পারে গ্রহহারা এক নিঃসঙ্গ এলিয়েনের সুপার স্ট্রেংথের মূল চাবিকাঠি।

আরেক অতিমানবীয় ক্ষমতা, ইনভালনারেবিলিটির ব্যাখ্যাতেও ক্রিপ্টনের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই। প্রায়ই সুপারম্যান চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কিন্তু ভয়ংকর মারণাস্ত্র, এমনকি পারমাণবিক বোমার আঘাতও তার কাছে নস্যি। এসবের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে—ক্রিপ্টনের অধিবাসীদের ব্যতিক্রমী আণবিক গঠন। মোটাদাগে যদি আণবিক ঘনত্ব তুলনামূলক অনেক বেশি হয়, অর্থাৎ দেহের অণুগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে, তাহলে বাহ্যিক আঘাতে সুপারম্যানের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া বা চামড়া ভেদ করে ভেতরে কিছু প্রবেশের আশঙ্কা থাকবে না বললেই চলে। ক্রিপ্টনের অতি মহাকর্ষ বিবেচনায় নিলে এ উপসংহার বেশ আশাব্যঞ্জক। আমরা জানি, একমাত্র ক্রিপ্টোনাইটই পারে সুপারম্যানকে কাবু করতে। এ তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলো থেকে নির্গত বিকিরণ তার দেহকোষের (নাক্ষত্রিক আলো থেকে প্রাপ্ত) শক্তি শোষণ এবং ব্যবহারের সক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তখন সামান্য আঘাতেই পরাস্ত করা সম্ভব এই সুপারহিরোকে। ব্যাটম্যান গড়পড়তা মানুষ হয়েও ঠিক এভাবেই পরাজিত করেছিল অমিত শক্তিশালী এই সুপারহিরোকে!

ভালো কথা, পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে সুপারম্যানের লাফের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও নেই বাধাহীন উড়ে বেড়ানোর ব্যাখ্যা। তবে কেউ কেউ বলেন, ক্রিপ্টনের শক্তিশালী মহাকর্ষ সামাল দিতে এ গ্রহের অধিবাসীদের দেহে তৈরি হয় 'অ্যান্টিগ্র্যাভিটি অর্গান'। অর্থাৎ প্রতিমহাকর্ষ অঙ্গাণু। মহাকর্ষক্ষেত্রকে এটি নাকচ করে দিতে পারে। পৃথিবীতে সেটিই সুপারম্যানকে দেয় উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা। বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় এটি মানা যায় না, তবে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যাটি বেশ আগ্রহোদ্দীপক, কী বলেন?

৪.

এবার চলুন দৃষ্টি দেওয়া যাক ডিসি কমিকসের আরেক জনপ্রিয় চরিত্র 'দ্য ফ্ল্যাশ'-এর দিকে। সেন্ট্রাল সিটি পুলিশ স্টেশনের তুখোড় ফরেনসিক সায়েন্টিস্ট ব্যারি অ্যালেন অনেকটা আকস্মিকভাবেই (বলা ভালো ভয়ংকর দুর্ঘটনার মাধ্যমে) লাভ করেছিল অতিমানবীয় ক্ষমতা, সুপারস্পিড। তীব্র গতিতে ছুটতে পারার এ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ফ্ল্যাশ বেশ কিছু অদ্ভুত কাজ করতে পারে। যেমন পানির ওপর দিয়ে দৌড়ানো, খালি হাতে বুলেট ধরে ফেলা, দেয়াল বেয়ে সোজা ওপরের দিকে দৌড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো কি আদৌ সম্ভব? চলুন, বিজ্ঞানের চোখে যাচাই করে দেখা যাক।

প্রথমেই আসি পানির ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়ানো প্রসঙ্গে। কোনো বস্তুকে পানির ওপরে রাখা হলে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে—হয় সেটি ডুবে যাবে, নয়তো ভেসে থাকবে। কোনটি ঘটবে, তা পুরোপুরি নির্ভর করে বস্তুর ওজন এবং এর মাধ্যমে অপসারিত পানির ওজনের ওপরে। যেকোনো বস্তুকে পানিতে রাখলেই সেটি তার পৃষ্ঠের আয়তনের সমান পানি সরিয়ে দেয়। কারণ, দুটি পদার্থ কখনো একই স্থান দখল করতে পারে না। এই সরে যাওয়া পানির ওজন যদি বস্তুর ওজনের চেয়ে বেশি

$W_1 > W_2$ হলে বস্তু পানিতে ডুবে যাবে;
$W_1 < W_2$ হলে বস্তু পানিতে ভেসে থাকবে;
$W_1 = W_2$ হলে বস্তুটি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় পানিতে ভেসে থাকবে;



বস্তুর ডোবা-ভাসার কারণ

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

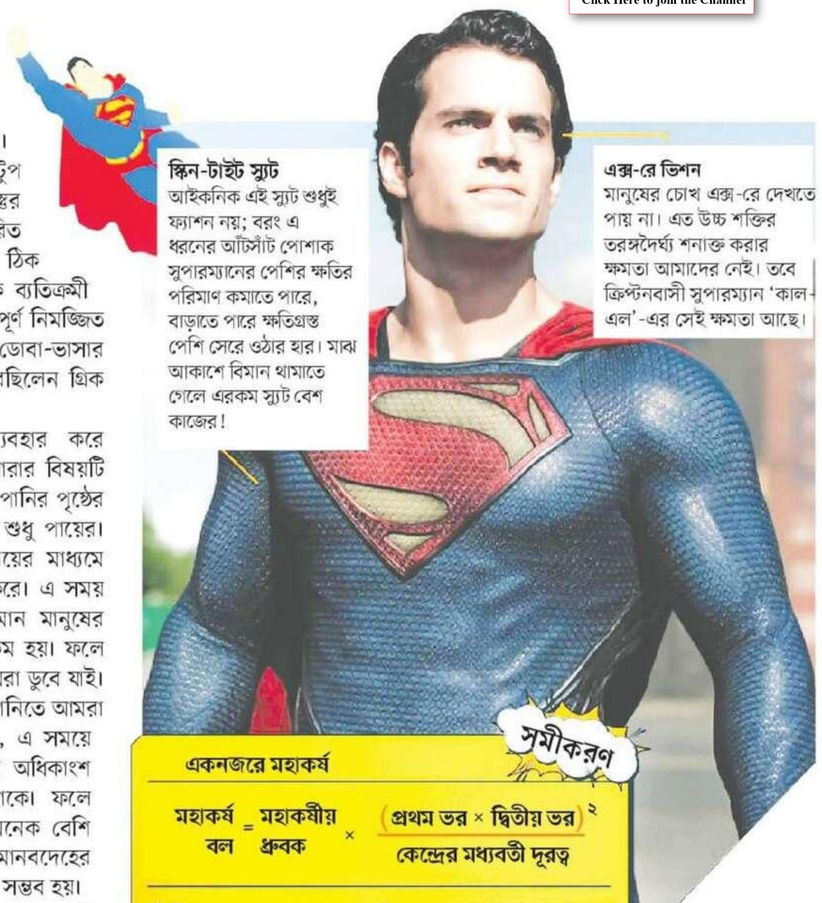
হয়, তাহলেই কেবল সেটি স্বাচ্ছন্দ্যে ভেসে থাকতে পারবে। আর উল্টোটা হলে বস্তুটি টুপ করে ডুবে যাবে। অন্যদিকে বস্তুর ওজন এবং এর দ্বারা অপসারিত পানির ওজন যদি পরস্পরের ঠিক সমান হয়, তাহলে ঘটবে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। তখন সেটি পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভেসে থাকবে। বস্তুর ডোবা-ভাসার এই নীতিগুলো আবিষ্কার করেছিলেন গ্রিক পদার্থবিদ আর্কিমিডিস।

আর্কিমিডিসের নীতি ব্যবহার করে মানুষের পানিতে হাঁটতে না পারার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। হাঁটার সময় পানির পৃষ্ঠের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে শুধু পায়ের। ফলে দেহের পুরো ওজন পায়ের মাধ্যমে সরাসরি নিচের দিকে কাজ করে। এ সময় অপসারিত পানির ওজনের মান মানুষের মোট ওজনের চেয়ে অনেক কম হয়। ফলে হাঁটার চেষ্টা করতে গেলেই আমরা ডুবে যাই। তবে হেঁটে যেতে না পারলেও পানিতে আমরা সহজেই ভাসতে পারি। কারণ, এ সময়ে পানির সঙ্গে আমাদের দেহের অধিকাংশ অংশের সরাসরি সংযোগ থাকে। ফলে অপসারিত পানির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। সেগুলোর সামগ্রিক ওজন মানবদেহের চেয়ে বেশি হওয়ায় ভেসে থাকা সম্ভব হয়।

স্পিডস্টার ফ্ল্যাশ কিন্তু আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই অবধারিতভাবে আর্কিমিডিসের নীতি তার ওপরও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তারও পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারার কথা নয়; কিন্তু পানির ওপর দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে না পারলেও সুপারস্পিড কাজে লাগিয়ে তাকে দিব্যি দৌড়াতে দেখা যায়! আসলে এই সময়ে আর্কিমিডিসের নীতি কাজ করার সুযোগই পায় না। ব্যাখ্যা করা যাক।

যেকোনো বস্তুই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। কঠিন পদার্থে এরা খুব কাছাকাছি থাকে। তরল পদার্থে এগুলোর অবস্থান বেশ অনেকটা দূরে দূরে। আর বায়বীয় পদার্থে এগুলোর মধ্যে থাকে যোজন যোজন ব্যবধান। পানিতে যখন হাঁটার চেষ্টা করা হয়, তখন পায়ের চাপে সেখানকার অণুগুলো খুব দ্রুত পাশে সরে যায়। ফলে পানি ভেদ করে পা ভেতরের দিকে চলে যায়। মাটির মতো কঠিন পদার্থের ওপর দিয়ে পথ চলার সময় মোটেও তা হয় না। ফ্ল্যাশ যখন তীব্র গতিতে পানির ওপর দিয়ে দৌড় চলে, তখন তার পায়ের নিচে থাকা পানির অণুগুলো আশপাশে সরে যাওয়ার জন্য দরকারি সময়টুকুও পায় না। তাই সেখানকার পানির আচরণ হয় অনেকটা শক্ত মাটির মতো। এ কারণেই ফ্ল্যাশের জন্য আর্কিমিডিসের নীতি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, একজন মানুষ প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ৩০ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারলে এভাবে পানির ওপর দিয়ে দৌড়াতে পারবে। পৃথিবীর দ্রুততম মানব উসাইন বোল্টের সর্বোচ্চ বেগ সেকেন্ডে মাত্র ১২.৪২ মিটারের কাছাকাছি। তাই শিগগিরই যে মানুষের পক্ষে পানির ওপর দিয়ে দৌড়ানো হচ্ছে না, তা বলা বাহুল্য।



৫.

খালি হাতে বুলেট থামিয়ে দেওয়ার মতো 'অসম্ভব'কে সম্ভব করতে পারে ফ্ল্যাশ। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় উপস্থিত থাকা নিরপরাধ মানুষদের জীবন বাঁচাতে মাঝেমধ্যেই তার এ কাজ করার প্রয়োজন পড়ে। মজার বিষয় হলো সুপারস্পিডকে সত্য ধরে নিলে এ ঘটনাও পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত।

এ জন্য প্রথমে জানতে হবে আপেক্ষিক বেগ সম্পর্কে। ধরুন, আপনি সাইকেলে করে সামনের দিকে ধীরেসুস্থে এগোচ্ছেন। এমন সময় আপনারই এক বন্ধু অন্য একটি সাইকেলে করে তাল মিলিয়ে একই বেগে পথচলা শুরু করল। যেকোনো স্থির বস্তুর সঙ্গে তুলনা করলে আপনারা উভয়েই গতিশীল। কিন্তু যদি নিজেদের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে আপনাদের দুজনকেই স্থির বলা চলে। কারণ, দিক ও বেগ একই হওয়ায় পারস্পরিক অবস্থানে সামান্যতম পরিবর্তন আসছে না। এই সময়ে পরস্পরের সাপেক্ষে আপনাদের বেগ তথা আপেক্ষিক বেগের মান শূন্য।

এ পর্যন্ত মানুষের তৈরি বুলেট প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১ হাজার ৪২২ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। ফ্ল্যাশ যে এর চেয়েও অনেক দ্রুত ছুটতে পারে, তা আর বলতে হয় না। সে বেগ ছাড়িয়ে যায় আলোর গতিকেও! তাই ফ্ল্যাশ যদি বুলেটের একদম সমান বেগ নিয়ে পাশে পাশে একই দিকে দৌড়াতে থাকে, তাহলে পরস্পরের আপেক্ষিক বেগের মান হবে শূন্য।

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

এ অবস্থার সঙ্গে এগুলোর উভয়েই স্থির অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকার মধ্যে বিন্দুমাত্র তফাত নেই। কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়াই যেমন মাটি থেকে স্থির বুলেট হাতে তুলে নেওয়া যায়, ঠিক তেমনি করে ফ্ল্যাশও গতিশীল বুলেটকে হাতে তুলে নিতে পারবে। তারপর সে যদি ক্রমে থেমে যায়, তাহলে বুলেটও স্থির হয়ে যাবে। ব্যস, এভাবেই হয়ে যাবে খালি হাতে বুলেট থামানো।

৬.

ফ্ল্যাশের নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে টাইম ট্রাভেল নিয়ে আলোচনা না করলে। মার্ভেল বা ডিসি, কমিক বই বা মুভি—সুপারহিরোদের দুনিয়ায় আজকাল এটিকে মোটামুটি সাধারণ ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। আর আলোর চেয়েও বেশি বেগে ছুটতে পারে বলে ফ্ল্যাশের কাছে এটি যেন ডাল-ভাতেরই নামান্তর। কখনো তাকে দেখা যায় অতীতে গিয়ে প্রিয় স্বজনের হত্যাকাণ্ড বা দুর্ঘটনা রুখে দেওয়ার চেষ্টা করতে, আবার কখনো দেখা যায় রিভার্স ফ্ল্যাশের মতো খলনায়কদের তাড়া করে ভবিষ্যতে পাড়ি জমাতে। সময় যেন তার আজ্ঞাবহ। অবশ্য রহস্যময় সময়কে চাইলেই পুরোপুরি করায়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই তো অগণিত টাইমলাইন এবং মাল্টিভার্সের চক্করে সঠিক পথের দিশা খুঁজে নিতে ফ্ল্যাশকে প্রায়ই হিমশিম খেতে দেখা যায়। আমাদের স্পিডস্টারের এসব রোমাঞ্চকর অভিযান সম্পর্কে বিজ্ঞান কী বলে?

শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা সময় পরিভ্রমণকে নিছক কাল্পনিক হিসেবে বিবেচনা করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাঁদের চোখে সময় ছিল এক অপ্রতিরোধ্য বহতা নদী। পৃথিবীতে এক সেকেন্ড সময় যতটুকু, মহাবিশ্বের অন্য যেকোনো প্রান্তেও এক সেকেন্ড ঠিক ততটুকুই। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা ঝড়ে সময়ের এ সরলীকরণ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, সময় সবার জন্য এক নয়। গতিশীল বস্তুর বেলায় সময় তুলনামূলক ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়। এরই পথ ধরে প্রথমবারের মতো সত্যি সত্যি রাস্তা উন্মুক্ত হয় সময় পরিভ্রমণের। তবে সে শুধুই ভবিষ্যৎপানে। মোটামুটি দুটি কৌশলে ঘটানো সম্ভব এটি—প্রায় আলোর কাছাকাছি বা সমান বেগে ছুটে চলা অথবা অকল্পনীয় মহাকর্ষের উপস্থিতি সম্পন্ন কোনো জায়গায় অবস্থান করা।

ধরুন, কেউ আলোর কাছাকাছি বেগে চলমান নভোযানে করে পৃথিবীর বাইরে থেকে বছরখানেকের জন্য ঘুরে এল। সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে পৃথিবীতে এই সময়কালে ঠিক এক বছরই পেরোনোর কথা; কিন্তু সময়ের অদ্ভুতুড়ে আপেক্ষিক চরিত্রের কারণে ফিরে আসার পর সে অবাক হয়ে দেখবে, পৃথিবীতে পেরিয়ে গেছে আরও কয়েক বছর! শুনতে কল্পকাহিনি মনে হলেও আসলেই এমনটা ঘটবে। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে অতি উচ্চ মহাকর্ষের কোনো মহাজাগতিক বস্তু, যেমন ব্ল্যাকহোলের পাশ দিয়ে কেউ যদি ছুটে যায় বা সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে, তাহলেও মোটামুটি একই ঘটনা ঘটবে।

> টাইম প্যারাডক্সের কবল থেকে রক্ষা পেতে কমিক বইয়ের লেখকেরা সামনে এনেছেন নতুন টাইমলাইন সৃষ্টি এবং মাল্টিভার্সের ধারণা

স্পিড ফোর্সের সুবাদে তীব্র বেগে ছুটতে পারার সক্ষমতার ফলে ফ্ল্যাশের ভবিষ্যৎ ভ্রমণ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মোটামুটি পাস মার্ক পায়। কিন্তু ঝামেলা বাধে অতীত ভ্রমণ নিয়ে। অতীতে যেতে হলে ছুটতে হয় আলোর চেয়েও বেশি বেগে। আদতে এটি মহাবিশ্বের মৌলিক নিয়মগুলোর সম্পূর্ণ পরিপন্থী! এ ছাড়া টাইম প্যারাডক্সগুলো নিয়ে ঝামেলা তো আছেই। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বহুল প্রচলিতটির নাম গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স। কেউ যদি অতীতে পরিভ্রমণ করে নিজের দাদাকেই সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে (টাইম ট্রাভেলারের বাবা) খুন করে, তাহলে কী ঘটবে? বাবাই জন্ম না নিলে কোনোভাবেই অস্তিত্ব থাকার কথা নয় সন্তান, তথা টাইম ট্রাভেলারের। তাই অতীতে গিয়ে তার পক্ষে দাদাকে মেরে ফেলার প্রশ্নই আসে না! এভাবেই তৈরি হয় প্যারাডক্সটি।

টাইম প্যারাডক্সের কবল থেকে রক্ষা পেতে কমিক বইয়ের লেখকেরা সামনে এনেছেন নতুন টাইমলাইন সৃষ্টি এবং মাল্টিভার্সের ধারণা। অর্থাৎ কেউ যদি অতীত পরিবর্তন করেই ফেলে, তাহলে প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টি হবে নতুন করে আলাদা শাখা 'টাইমলাইন'। এই তত্ত্ব অনুসারে, অতীতে গিয়ে পূর্বপুরুষকে ঠিকই খুন করা সম্ভব। তবে সেটার ফল হিসেবে বদলে যাবে গোটা ভবিষ্যতের গতিপথ। টাইম ট্রাভেলার প্রবেশ করবে নতুন এক টাইমলাইনে। সেখানে অস্তিত্ব থাকবে না তার চেনাজানা কারোই। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া *দ্য ফ্ল্যাশ* মুভিতে

ফ্ল্যাশের খালি হাতে বুলেট থামানো



প্রথমে বুলেটের বেগ ফ্ল্যাশের চেয়ে বেশি, সেকেন্ডে প্রায় ১,৪২০ মিটার।

এখন ফ্ল্যাশ ও বুলেটের বেগ সমান, অর্থাৎ এদের আপেক্ষিক বেগ শূন্য।

ফ্ল্যাশ দৌড় থামিয়ে দেওয়ায় এখন উভয়ের বেগ শূন্য।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

আবার টাইমলাইনের বিষয়টিকে খানিকটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি অনুসারে, কেউ যদি অতীতে ফিরে গিয়ে ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা পরিবর্তন করে, তাহলে তার প্রভাব কেবল সময়ের নতুন শাখা সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমূল বদলে যেতে পারে গোটা টাইমলাইন। পরিবর্তন ঘটতে পারে অতীত ও ভবিষ্যৎ তথা সময়রেখার দুই দিকেই! এ ছাড়া এ মুভিতে ব্যবহার করা হয় 'ফিক্সড পয়েন্ট'-এর ধারণা। অর্থাৎ এমন কিছু ঘটনার অস্তিত্ব থাকবে, যেগুলো সব টাইমলাইনেই মোটামুটি একইভাবে সংঘটিত হয়। এগুলো বদলাতে গেলে তৈরি হতে পারে ভয়ংকর বিপর্যয়। সাদাসিধে ফরেনসিক সায়েন্টিস্ট ব্যারি অ্যালেনের ফ্ল্যাশ হয়ে ওঠা বা এক ক্রিপটনবাসীর (সুপারম্যান) পৃথিবীতে আগমন বা ব্রুস ওয়েনের (ব্যাটম্যান) বাবা-মায়ের হত্যাকাণ্ড—সবই এই ফিক্সড পয়েন্টের অংশ।

৭.

ডিসির অন্য সুপারহিরোদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে লেখাটা অনেক বড় হয়ে যাবে। ছোট্ট করে দুজনের কথা বলি। এক, ওয়ান্ডার ওম্যান। সুপারম্যানের মতোই মহাকর্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশাল সব লাফ দিতে পারে সে। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, উড়তেও পারে। তবে ওয়ান্ডার ওম্যানের ওড়ার ব্যাখ্যায় ক্রিপ্টনের কথা আসবে না। বরং সে কিংবদন্তির চরিত্র। ডায়ানা নামের এই সুপারহিরো অ্যামাজনদের রাজকুমারী, দেবী হেরা এবং গ্রিক মিথলজির জিউসের কন্যা। থেমিস্কিরা নামে এক গোপন দ্বীপে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেখানে অ্যামাজনের নারীরা কঠোর প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের কলাকৌশল আয়ত্ত করে।

কমিক বইপ্রেমীরা বলেন, ডায়ানা ও অ্যামাজনের নারীদের শরীরের অস্বাভাবিক পেশি ঘনত্ব বা মাসল ডেনসিটি তার শক্তির একটি বড় কারণ। সাধারণত মানুষের পেশি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু কারও পেশির তন্তুগুলো অনেক বেশি ঘন হলে সেগুলোতে অতিরিক্ত মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতে পারে,

সুপারহিরোদের সঙ্গে আপেক্ষিকতার সম্পর্ক কী

সমীকরণ

শক্তি = ভর × (আলোর বেগ)²

আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ বলে, কোনো বস্তু ভরকে আলোর বেগের বর্গ দিয়ে গুণ করলে সমতুল্য শক্তির মান পাওয়া যায়। এর মানে, শক্তি যোগ করলে তা ভর বেড়ে যাওয়ার সমতুল্য। ফলে ফ্ল্যাশ যত জোরে ছুটবে, তার দেহ তত ভারী হতে থাকবে।



গতিসীমা

ফ্ল্যাশ অত্যন্ত দ্রুতগামী, তবে বাস্তবে আলোর বেগই মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ গতি। এর চেয়ে দ্রুত ফ্ল্যাশও ছুটতে পারবে না (পারা উচিত নয়)।

গতি বৃদ্ধি বা ত্বরণ
কোনো কণা বা বস্তুর বেগ বাড়াতে হলে তাকে বাইরে থেকে শক্তি দিতে হবে।

যত ভারী, তত বেশি শক্তি প্রয়োজন
কোনো বস্তু যত ভারী হবে, তাকে আরও গতিশীল বা ত্বরান্বিত করতে তত বেশি শক্তি দিতে হবে বাইরে থেকে।

অসীম শক্তি
কোনো কণা যখন আলোর বেগে পৌঁছে যায়, তখন তার ভর হয়ে যাবে অসীম। ফলে তাকে অসীম পরিমাণ শক্তি দিতে হবে ত্বরান্বিত করতে।

সর্বোচ্চ সীমা
ভরহীন কণা, যেমন ফোটন মহাবিশ্বে সর্বোচ্চ বেগ, অর্থাৎ আলোর বেগে ছুটতে পারে।

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

জানেন কি

দ্য ডার্ক নাইট মুভিতে ব্যাটম্যান একটি সত্যিকারের নাসকার (NASCAR) রেস কার নিয়ে ছুটে যায়। এই গাড়িটি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগ তুলতে পারে।



ব্যাটম্যানের স্যুট কেভলার দিয়ে তৈরি, যা সামরিক বাহিনীগুলো বাস্তবেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।

ব্যাটম্যানের প্রযুক্তি কি বাস্তব



গথাম সিটির রক্ষক ব্যাটম্যান নিতান্ত সাধারণ মানুষ। কিন্তু দক্ষতা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সে অসাধ্য সাধন করে।

ব্যাটম্যানের বেশির ভাগ ক্ষমতার পেছনে আছে প্রযুক্তি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এর বেশির ভাগই বাস্তবে সম্ভব। যেমন তার মোটরসাইকেলে 'স্টেলথ মোড' আছে, বাস্তবেও এ রকম প্রযুক্তি আছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত খোলসের পদার্থটি রাডার বা যেকোনো শনাক্তকারী যন্ত্রের তরঙ্গ শুষে নেয় এবং নিজস্ব তাপ ও শব্দ যথাসম্ভব কম নির্গত করে। ব্যাটকার-এ সে জন্য আছে বিশেষ 'ক্যামোফ্লেজ' বা ছদ্মবেশী প্রযুক্তি, যা ইনফ্রারেড বা অবলোহিত ক্যামেরার মধ্য দিয়ে তাকালেও আলাদাভাবে বোঝা যায় না। বিশেষ প্যানেল তাপ নিঃসরণ করার ক্ষেত্রে আশপাশের তাপের সমান তাপ নির্গত করার মাধ্যমে ট্যাংকের সব চিহ্ন আড়াল করে ফেলে। ফলে বাইরে থেকে মনে হয় ওটা সাধারণ গাড়ি।

ব্যাটম্যানের স্যুটও বাস্তবধর্মী—অন্তত ক্রিস্টোফার নোলানের বানানো *ব্যাটম্যান ট্রিলজি*তে। এ ক্ষেত্রে স্যুটটি 'কেভলার' দিয়ে বানানো, আধুনিক প্রায় সব সামরিক বাহিনি এ ধরনের স্যুট ব্যবহার করে। কেভলারের আঁশগুলো এত শক্তভাবে বোনা যে বুলেটও এর মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু বুলেটের গতিশক্তির কী হবে? কেভলারের আঁশগুলো হালকা প্রসারিত হওয়ার মাধ্যমে এ শক্তি শুষে নেয়। ফলে বুলেট গতি হারিয়ে ফেলে।

পতনের পর বেঁচে থাকার বিজ্ঞান

ঝাঁপ দেওয়ার ফলে কী হবে, সেই গাণিতিক হিসাব সব সময় ব্যাটম্যানের পক্ষে থাকে না

উচ্চতা বেশি হলে ঝাঁপ
যুক্তরাষ্ট্রের লেচেস্টার ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন, ব্যাটম্যান যদি ১০ তলা বিল্ডিং (১৫০ মিটার ওপর) থেকে ঝাঁপ দেয়, কেপের ফলে সে প্রায় ৩৫০ মিটার ভেসে যাবে। কিন্তু তার বেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ৮০ কিলোমিটার। পতনের ধাক্কা শুষে নেওয়ার প্রযুক্তি না থাকলে এর ফলে নিচে আঘাত করার সময় নিশ্চিতভাবেই মারা পড়বে ব্যাটম্যান!

০ সেকেন্ড
ব্যাটম্যান এখান থেকে যাত্রা করবে

০.৫ সেকেন্ড পর
ইতিমধ্যে ব্যাটম্যান ০.৫ মিটার ভ্রমণ করেছে

উইংস্প্যান
ব্যাটম্যানের শক্ত কেপটি প্রায় ৪.৫ মিটার প্রসারিত, স্ট্যান্ডার্ড হ্যাং গ্লাইডারের চেয়ে অনেক ছোট।

১ সেকেন্ড পর
ব্যাটম্যান ৫ মিটার ভ্রমণ করেছে

ড্রাগ
উইং বাতাসের বাধা কাজে লাগিয়ে ব্যাটম্যানের পতনের গতি কমিয়ে দেয়।

১.৫ সেকেন্ড পর
মহাকর্ষের কারণে ব্যাটম্যান ১০.৫ মিটার ভ্রমণ করেছে

আঘাত
মহাকর্ষের কারণে এ সময় ব্যাটম্যানের গাড়ির ওপর সেকেন্ডে ১৫ মিটার বা ঘণ্টায় ৫৪ কিলোমিটার বেগে পড়ার কথা। তবে কেপ এ বেগ কমিয়ে দেয়, তাই সে বেঁচে যায়।

সমীকরণ

পতনশীল বস্তু

$$\text{সময়} = \sqrt{\frac{২ \times \text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{ত্বরণ}}}$$

বেগ = অভিকর্ষ ত্বরণ × সময়

স্বাভাবিকভাবে ব্যাটম্যানের পতনের সময় সেকেন্ডে ৯.৮ মি/সেকেন্ড হারে ত্বরণ হওয়ার কথা। এ থেকে হিসাব করা যায় সে কত জোরে নিচে পড়বে। কিন্তু স্যুটের পেছনের 'কেপ' এবং হাতের 'উইংস' ছড়িয়ে দিয়ে, বাতাসের বাধা ব্যবহার করে ব্যাটম্যান এই ত্বরণ কমিয়ে নেয়।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ফলে শক্তি উৎপাদনের হার হবে অনেক বেশি। এ জন্য হাড়ের গঠন ও স্নায়ুতন্ত্রকেও অনেক শক্তিশালী হতে হবে। অ্যামাজন যেহেতু পৃথিবীতেই, তাই জেনেটিক মিউটেশন ছাড়া এর কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। কমিক বইয়ে অবশ্য সেই ব্যাখ্যা নেই; বরং কিংবদন্তি হিসেবে অব্যাখ্যাত 'অতিলৌকিক' বলেই তাকে দেখানো হয়েছে। যে কারণে ডায়ানার 'বুলেটপ্রুফ' ক্ষমতা বা অন্য ক্ষমতাগুলো অনেক তলিয়ে দেখার অর্থ নেই। তবে বিজ্ঞানের চোখে, কারও ত্বক, পেশি ও হাড় অবিশ্বাস্য রকম স্থিতিস্থাপক হলে এবং কোষের সোরে ওঠা ও বিভাজনের মাধ্যমে নতুন কোষ তৈরির হার অনেক বেশি হলে এমনটা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হতেও পারে। কিছু উভচর প্রাণী ও সরীসৃপের দেহে এ ধরনের ক্ষমতা দেখা যায়। আর ওয়ান্ডার ওম্যানের ল্যাসো অব ট্রুথ? কিংবদন্তি বা জাদুর এই দড়ির ব্যাখ্যায় বলা যায় 'প্লাসিবো ইফেক্ট'-এর কথা। যাকে এই দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, সে যদি মানসিকভাবে এই বিশ্বাস করে যে তাকে সত্যি বলতে হবে, তাহলে এর বাইরে কিছু সে করতে পারবে না। কিন্তু মুভি বা কমিক বইয়ে ডায়ানার ল্যাসো অব ট্রুথ আরও বড় কিছু। কাজেই এই ব্যাখ্যার চেয়ে এটিকে বিজ্ঞানের চোখে অব্যাখ্যাত বলাই ভালো।

শেষ করার আগে আরেকজন সুপারহিরোর কথা বলা যাক। আর্থার কারি তথা অ্যাকুয়াম্যান। পানির নিচে তার বাস। জলজ প্রাণীদের সঙ্গে কথাও বলতে পারে সে। এসব কি সত্যিই সম্ভব?

এ জন্য প্রথমেই একটা অবাস্তব ধারণা ধরে নিতে হবে। আটলান্টিসের রাণী আটলান্না ও সাধারণ মানুষ টম কারির সন্তান অ্যাকুয়াম্যান। কাজেই আটলান্টিসের মানুষদের ক্ষমতা সে পেয়েছে। এই সভ্যতার মানুষদের মাছের মতো ফুলকা থাকে। ফলে তারা পানির নিচে শ্বাস নিতে পারে, পানি থেকে অক্সিজেন শুষে নিতে পারে। মাছ এটা করতে পারে, কিন্তু বলা বাহুল্য, মানুষের এ ক্ষমতা নেই। কিন্তু হাজার বছর ধরে মানুষের কোনো সভ্যতা পানির নিচে বসবাস করলে তাদের এমন ক্ষমতা হতেই পারে। শুধু তা-ই নয়, পানিতে বসবাসের ফলে আটলান্টিসের মানুষদের শরীর এমনভাবে অভিযোজিত হবে যে পানির বাধা কাটিয়ে দ্রুত সাঁতার কাটতে পারবে তারা। এটাই ঘটতে দেখা যায় আর্থার কারির বেলায়। তবে সুপারসনিক বা শব্দের বেগে সাঁতার কাটা তাত্ত্বিকভাবেও প্রায় অসম্ভব। কারণ, এতে পানির চাপ কমে গিয়ে বুদ্‌বুদ তৈরি হয়। এই বুদ্‌বুদগুলো ফেটে গিয়ে বিপুল শকওয়েভ তৈরি করে। এটাকে বলা হয় ক্যাভিটেশন। সাবমেরিন বা টর্পেডোর ক্ষেত্রে এই ক্যাভিটেশন বড় সমস্যা তৈরি করে। এই শকওয়েভের জন্য যে বিশেষ সুরক্ষা প্রয়োজন, তা অ্যাকুয়াম্যান কীভাবে পায়, সেই ব্যাখ্যা আমরা জানি না।

আরেকটি বিষয় হলো অ্যাকুয়াম্যানের জলজ প্রাণীদের সঙ্গে কথা বলা ও তাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। অ্যাকুয়াম্যান এ কাজ করে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে। টেলিপ্যাথি বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া হয়, ডলফিন বা তিমির মতো প্রাণীরা যে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে যোগাযোগ করে, অ্যাকুয়াম্যান তা শুনতে পায় এবং এর মাধ্যমে তাদের নির্দেশ দিতে পারে, তাহলে এর কিছুটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, রুপালি পর্দা ও কমিক বইয়ের এত সব অদ্ভুত তত্ত্বের কোনোটারই আপাতত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে এই সম্ভাবনাগুলো রোমাঞ্চকর। তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব ঘটনাগুলো তাই বারবার উসকে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের কল্পনা।

আবার সুপারহিরোদের অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনাই বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এতে মন খারাপ বা নাক সিঁটকানোর কিছু নেই। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আনন্দ দেওয়া। সেটি পূরণের পাশাপাশি যদি নতুন কিছু শেখা যায়, তাহলে সেটি উপরি পাওনা। তাই এগুলোতে বিজ্ঞানের শতভাগ বিশুদ্ধ উপস্থিতি নিয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাওয়া মোটেও সমীচীন নয়।

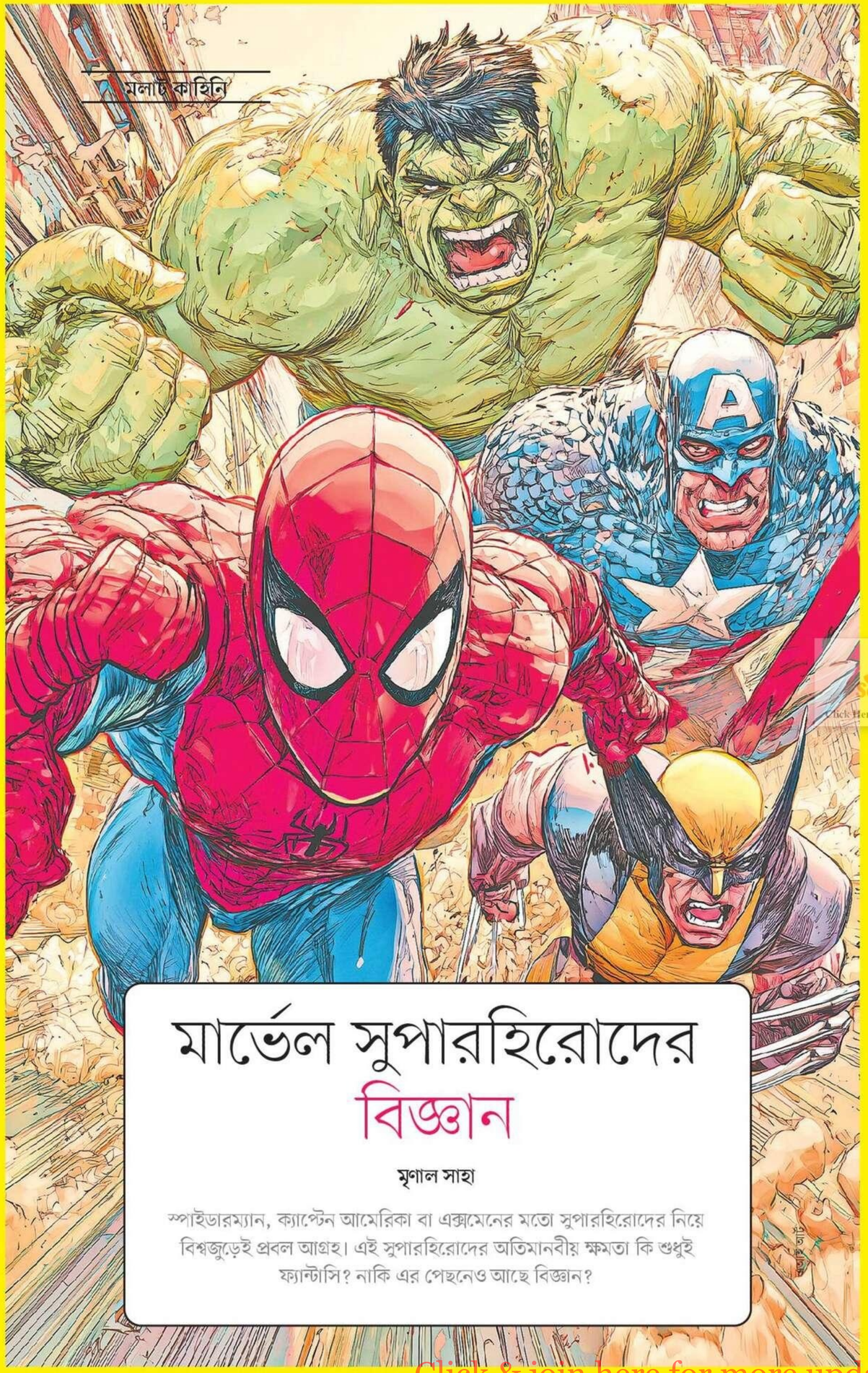
লেখক: সহকারী ব্যবস্থাপক, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, রূপপুর, পাবনা

সূত্র: *দ্য ফিজিকস অব সুপারহিরোস*, জেমস কাকালিওস



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



মলাট কাহিনি

মার্ভেল সুপারহিরোদের বিজ্ঞান

মৃণাল সাহা

স্পাইডারম্যান, ক্যাপ্টেন আমেরিকা বা এক্সমেনের মতো সুপারহিরোদের নিয়ে বিশ্বজুড়েই প্রবল আগ্রহ। এই সুপারহিরোদের অতিমানবীয় ক্ষমতা কি শুধুই ফ্যান্টাসি? নাকি এর পেছনেও আছে বিজ্ঞান?

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

আমাদের বড় হয়ে ওঠা সুপারহিরোদের সঙ্গে। বিশেষ করে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের উত্থানের পর বড় পর্দার সুপারহিরোরা যেন হয়ে উঠেছে প্রতিবেশী। চোখ মেললেই দেখা মেলে ক্যাপ্টেন আমেরিকা, হাল্ক, আয়রনম্যানদের। স্পাইডার-ম্যান, ফ্যান্টাস্টিক ফোর তো আছে আরও আগে থেকেই। কিন্তু এই যে এত এত সুপারহিরো দেখা যায় পর্দায় বা কমিকের বইয়ে, তাদের সুপারপাওয়ারগুলো ঠিক কতটা বিজ্ঞানসম্মত? ভিএফএক্সের যুগে তো পর্দায় দেখানো যায় সবকিছুই, কিন্তু বাস্তবে তার ঠিক কতটুকু সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আলবার্ট আইনস্টাইনের নামে প্রচলিত একটি উক্তির কথা বলা যায়, 'এভরিওয়ান নিউ ইট ওয়াজ ইম্পসিবল, আনটিল আ ফুল হু ডিডন্ট নো কেইম অ্যালং অ্যান্ড ডিড ইট'; অর্থাৎ সবাই জানত ওটা সম্ভব নয়। তারপর এক বোকা এল। সে জানত না ওটা অসম্ভব, তাই কাজটা করে ফেলল! উক্তিটি আসলেই আইনস্টাইনের কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে বাক্যের ভাবার্থটি স্বয়ং আইনস্টাইনের ক্ষেত্রেও সত্য, বিজ্ঞানে আগ্রহীমাত্রই এ কথা জানেন। ফলে এই লেখায় যা হয়নি (আবিষ্কৃত হয়নি বা প্রমাণ মেলেনি), তাকেই আমরা চট করে অসম্ভব বলব না। আমরা বরং অসম্ভবের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে তত্ত্বীয় সম্ভাবনা খতিয়ে দেখব; অর্থাৎ এখনো হয়নি; কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে হতে পারে—এমন বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করব। কোনগুলো সম্ভব নয় একদমই, জানার চেষ্টা করব তা-ও।

আতশি কাচের নিচে ফেলে সুপারহিরোদের বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথাগত অর্থে সুপারহিরো বলতে আমরা বুঝি সুপারপাওয়ার লাভ করা ব্যক্তিদের, যারা নিজেদের শক্তি কাজে লাগিয়ে অন্যের ভালো করতে চায়। অন্যদিকে যারা ক্ষতি করতে চায়, তাদের আমরা বলি সুপারভিলেন। এই লেখায় আমরা শুধু সুপারহিরোদের নিয়ে আলাপ করব।

সুপারহিরো প্রত্যেকে একইভাবে সুপারপাওয়ার পায়নি। কারও সুপারপাওয়ার এসেছে গ্যাজেট থেকে, কেউ আবার ব্যবহার করে জাদুবিদ্যা। এই লেখায় আমরা আলোচনা করব সেসব সুপারহিরোকে নিয়ে, যাদের সুপারপাওয়ার একেবারে প্রাকৃতিক কিংবা বায়োলজিক্যাল বা জীববৈজ্ঞানিক। গ্যাজেট বা জাদুবিদ্যা নয়; বরং তাদের শরীরের ভেতরেই সুপ্ত তাদের সুপারপাওয়ার।

২.

শারীরিক শক্তি বিবেচনায় সবার প্রথমে চোখে ভেসে ওঠে হাল্কের ছবি। শুধু মার্ভেল নয়, কমিকস বুক সুপারহিরোর ইতিহাসে হাল্কের মতো বায়োলজিক্যালি সুপিরিয়র হিরো খুব কমই এসেছে। হাল্ক সাধারণ কোনো সুপারহিরো নয়; বরং স্প্লিট পারসোনালিটিতে ভোগা একজন বিজ্ঞানী। ব্যক্তিগত জীবনে সে সাধারণ মানুষের মতোই বসবাস করে। কিন্তু যখনই তার হার্টবিট বা হৃৎকম্পন বেড়ে যায় কিংবা সে রেগে যায়, তখনই পরিণত হয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এক সবুজ দানবে। ব্যক্তি ব্রুস ব্যানারের সঙ্গে দানব হাল্কের পার্থক্য শুধু গড়নে নয়, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা—সবকিছুতেই বিস্তর ফারাক। এমনকি হাল্ক থাকা সময়ে সত্তাটি ব্যক্তি ব্রুস ব্যানারের সব স্মৃতিও হারিয়ে ফেলে। হাল্ক থেকে মানুষরূপে ফেরার পরও ঘটে একই ঘটনা। মনস্তত্ত্ববিদেরা এ ধরনের ঘটনাকে বলেন 'স্প্লিট পারসোনালিটি'। একে অনেকে ডিআইডি বা ডিসসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিজঅর্ডারও বলেন। এটি মূলত একধরনের মানসিক সমস্যা, যার কারণে এক ব্যক্তি নিজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব কিংবা বিহেভিয়র প্যাটার্ন, মানে আচরণের ধরন তৈরি করে। যার একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো মিল নেই। ট্রমা রেসপন্স থেকে সাধারণত এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

ব্রুস ব্যানারের ক্ষেত্রেও ঘটনা তেমনই। ছোটবেলা থেকেই বাবার কাছে অত্যাচারিত হয়েছে সে। পরে গামা রেডিয়েশন দুর্ঘটনায় হাল্ক ও ব্রুস ব্যানার—দুটি আলাদা ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় মানুষটি। সেখান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পার্থক্য। ডক্টর ব্রুস ব্যানার মোট সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি করেছে। অন্যদিকে হাল্ক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এক দানব ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হাল্কের সব পরিবর্তন ঘটেছে ডিএনএ মিউটেশনের মধ্য দিয়ে।

গামা রেডিয়েশন দুর্ঘটনায় তার শরীরে বিপুল পরিমাণে গামা রশ্মি প্রবেশ করে। শরীরে অতিরিক্ত গামা রশ্মি প্রবেশ করায় ডিএনএ বদলে যায়। এ জন্য যখনই ব্রুস ব্যানার উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখনই মানুষ থেকে পরিণত হয় দানবে। এ কারণে কয়েকটি শারীরিক পরিবর্তন একসঙ্গে ঘটে। যেমন শরীরে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়, শরীরে শক্তির পরিমাণ প্রায় কয়েক গুণ হয়ে যায়। বাস্তব জীবনেও এ ধরনের জিনিস ছোট স্কেলে দেখা যায়, যেমন হাইপারট্রফি বা হাইপারপ্লাসিয়া হয় মানুষের। কোষ বা অঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শরীরের কোষের পরিমাণ বাড়ানো, শক্তিমত্তায় পরিবর্তন আনা—এ সবকিছুই বাস্তব জীবনে ছোট পরিসরে সম্ভব। তবে এত পরিমাণ গামা রশ্মি একসঙ্গে শরীরের প্রবেশ করলে তা থেকে সুপারপাওয়ার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আসলে নেই; বরং ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যাবে বহুগুণ। এই ক্যানসারের কারণে শরীরে কোষের মৃত্যুহার বেশি হলে মানুষ মারা যেতে পারে।

হাল্ক মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের প্রথমদিককার সুপারহিরো হলেও গত কয়েক বছরে হাল্কের মতো একই পাওয়ারধারী কয়েকজন সুপারহিরো এবং ভিলেনকে দেখা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শি-হাল্ক, রেড হাল্ক ও স্কার। শক্তিমত্তার দিক থেকে একই রকম হলেও কিছুটা ভিন্নতা আছে তাদের মধ্যে। শি-হাল্ক বা জেনিফার ওয়াল্টারস পেশায় আইনজীবী। ব্রুস ব্যানারের সঙ্গে এক জায়গায় যাওয়ার সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় হাল্কের রক্ত তার শরীরে প্রবেশ করে। এরপর সে শি-হাল্কে পরিণত হয়। তবে শি-হাল্কের কোনো স্প্লিট পারসোনালিটি নেই। মানব ও দানব—দুই রূপেই সে একই সত্তা, সব স্মৃতি তার মনে থাকে।

স্কার হাল্কের একমাত্র সন্তান। তার কোনো মানবরূপ বা স্প্লিট পারসোনালিটি নেই।

মার্ভেলের হাল্ক ক্যাটাগরিতে সর্বশেষ সংযোজন রেড হাল্ক। আর্মি জেনারেল ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট থান্ডারবোল্ট



ক্যাপ্টেন আমেরিকা

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

রসের অলটারনেট ইগো রেড হাল্ক। তাকে ওষুধের মাধ্যমে ছোট ছোট ডোজে গামা রেডিয়েশন দেওয়া হতো শরীরে। একসময় তা ওভারডোজ হয়ে হাল্কে পরিণত হয় সে। হাল্কের মতো স্প্লিট পারসোনালিটি দেখা যায় তার মধ্যেও। রেড হাল্ক সাধারণ হাল্কের চেয়ে বেশি রাগী ও শক্তিশালী। অতিরিক্ত রেগে গেলে তার শরীর থেকে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গও বের হতে দেখা যায়। এদের কোনোটিই ঠিক বাস্তব নয়, এ রকম ওষুধের মাধ্যমে কোষে তেজস্ক্রিয়তা ঢুকিয়ে সুপারপাওয়ার পাওয়া সম্ভব নয়।

৩.

মার্ভেলের কল্পবিশ্বে আমরা দেখি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'সুপারসোলজার' প্রকল্প হাতে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। এর মূল লক্ষ্য ছিল বায়োলজিক্যালি পারফেক্ট একজন যোদ্ধা তৈরি করা, যে যুদ্ধের গতিপথ বদলে দেবে। সে জন্য মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে খোঁজা হচ্ছিল একজন পারফেক্ট সৈনিককে। কিন্তু স্টিভ রজার্স কোনোভাবেই সেই ছকের মানুষ ছিল না। অ্যাজমা, হৃদ্‌রোগ, চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা, হাড়ে ব্যথা, ওজন কম—আনফিটের প্রতিটি ক্যাটাগরিতে টিক ছিল তার। তবু সততা, কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় মানসিকতার কারণে শারীরিকভাবে আনফিট হয়েও সুপারসিরামের জন্য মনোনীত হয় স্টিভ। ডাক্তার আব্রাহাম আরস্কিনের তৈরি সুপারসোলজার সিরাম শরীরে প্রবেশ করালে স্টিভ রজার্স পরিণত হয় একজন 'পারফেক্ট হিউম্যান'-এ।

সুপারহিউম্যান সিরামকে সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেও খুব একটা ভুল হবে না। সুপারহিরোর জগতে যে কজনকে বায়োলজিক্যালি এক্সপ্লেইন করা সম্ভব, তাদের অন্যতম ক্যাপ্টেন আমেরিকা। কারণ, স্টিভ রজার্সের মতো হতে চাইলে যা যা করতে হবে, তার প্রায় সবটাই বাস্তবে করা সম্ভব। বাস্তবে সুপারসিরামের অস্তিত্ব না থাকলেও বিভিন্ন স্টেরয়েড ও সাপ্লিমেন্ট রয়েছে, যা দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শরীরের পরিবর্তন সম্ভব, যা শরীরের জন্য অনেকখানি হানিকারকও বটে। কিন্তু বাস্তবে সুস্থভাবে অর্জন করতে চাইলে এর একমাত্র পথ নিয়ম মেনে চলা। শরীরচর্চার সব নিয়ম মেনে চললে পর্দার স্টিভ রজার্সের মতো শরীর যেমন তৈরি করা সম্ভব, গতিতে বা রিফ্লেক্সে টেক্কা দেওয়াও সম্ভব। তবে বয়স আটকে রাখাটা অসম্ভব বটে। সে রকম কোনো ওষুধ এখনো বিজ্ঞানীরা বানাতে পারেননি। ওদিকে মার্ভেলের জগতে সুপারসিরামের প্রভাবে বয়সের প্রভাবও অনেকটাই কেটে গেছে স্টিভ রজার্সের। অবশ্য এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে তার প্রায় ৭০ বছরের হাইবারনেশন বা শীতনিদ্রা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আর্কটিকে বিমান ক্র্যাশ করে বরফের ভেতর আটকা পড়ে স্টিভ রজার্স। এরপর কেটে যায় প্রায় ৭০ বছর। সবাই তাকে মৃত ধরে নিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ খোঁজ মেলে তার দেহের। দেখা যায়, মানুষটি বেঁচে তো আছেই, দিব্যি সুস্থও আছে।

বাস্তবে ক্রায়োজেনিক প্রিজারভেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন কোষ ও এমব্রায়ো বা ভ্রূণ সংরক্ষণ করে রাখা হয়, যা পরবর্তীকালে ব্যবহার করা সম্ভব। এ ছাড়া শীতনিদ্রা প্রকৃতিতেই দেখা যায়। কিছু কিছু আর্কটিক ব্যাঙ ও কচ্ছপ দীর্ঘ সময়ের জন্য শীতনিদ্রায় যায়, লম্বা সময়ের জন্য বরফে থাকলেও তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ, তাদের শরীরে তৈরি হওয়া 'অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন' তাদের বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। এই 'অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন' নামটি মোটেও বানানো নয়। সত্যিই এ রকম বেশ কয়েক ধরনের প্রোটিন আছে। মাছের দেহে এ রকম চার ধরনের প্রোটিন দেখা যায়, পোকামাকড়ের দেহে তিন ধরনের, আরও নানা রকম অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিনও পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাণীর দেহে। মার্ভেলের বাকি সুপারসোলজাররা, বিশেষ করে উইন্টার সোলজারখ্যাত বাকি বার্নসের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই রকম।

৪.

মার্ভেল মাল্টিভার্সে এখন পর্যন্ত তিনজন ভিন্ন ভিন্ন স্পাইডার-ম্যানের গল্প দেখানো হয়েছে। নাম ও ব্যাকস্টোরি এক হলেও শক্তিমত্তার দিক থেকে তিনজনের রয়েছে বেশ খানিকটা পার্থক্য। শুরুতেই বলা দরকার, এই লেখায় মাল্টিভার্স বা বহু মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করব না। সেটা ভিন্ন আলোচনা। আমরা শুধু জীববৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

টবি ম্যাগুইয়ার অভিনীত *স্পাইডার-ম্যান* ট্রিলজিতে উঠে এসেছে সম্পূর্ণ বায়োলজিক্যাল স্পাইডার-ম্যানের গল্প। অন্যদিকে অ্যান্ড্রু গারফিল্ডের অ্যামেজিং স্পাইডার-ম্যান কিংবা মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সে টম হল্যান্ডের স্পাইডার-ম্যান মূলত গ্যাজেটনির্ভর। গ্যাজেটের কথাও আপাতত তোলা থাকুক, আমরা তাদের জীববৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করি। সে জন্য বেছে নেব টবি ম্যাগুইয়ারের স্পাইডার-ম্যানকে।

হাইস্কুলে পড়ুয়া পিটার পার্কার স্পাইডার-ম্যানে পরিণত হয় জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড; অর্থাৎ জিনপ্রকৌশলবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, এমন এক সুপারস্পাইডারের কামড় খেয়ে। 'সুপারস্পাইডার'-এর কামড় খেয়ে ডিএনএ বদলে যায় পিটার পার্কারের; অর্থাৎ মিউটেশন হয়। মিউটেশন জিনিসটা বাস্তবেই প্রকৃতিতে হয়, ফলে বিভিন্ন প্রাণীর দেহে



এক্স-মেন

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

দেখা যায় অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্য। এ রকমই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে পিটারের ক্ষেত্রে। হাতে ছোট ছোট সেটা বা ব্রিস্টল গজায়, যা দিয়ে সহজে দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে স্পাইডার-ম্যান। ডিএনএর সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় তার শারীরিক গড়নও। শরীরে সঞ্চিত হয় বিপুল শক্তি, দ্রুততা, রিফ্লেক্স বা প্রতিক্রিয়া দ্রুততর হয়ে ওঠে, সঙ্গে গড়ে ওঠে 'স্পাইডার-সেন্স'। আশপাশের পরিবেশ ও শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে মাকড়সা নিজেদের বিপদ আঁচ করতে পারে। স্পাইডার-ম্যানের মধ্যেও সেই বিপদ আঁচ করার ক্ষমতা তৈরি হয়।

তিন স্পাইডার-ম্যানের শক্তিমত্তা একই হলেও টবি ম্যাগুইয়ারের স্পাইডার-ম্যান আলাদা ছিল ভিন্ন একটি কারণে। কমিকস বই ও স্পাইডার-ম্যানের বাকি সিনেমাগুলোয় স্পাইডারওয়েব বা মাকড়সার জালের মতো জাল তৈরি করা হয় গ্যাজেট দিয়ে। কিন্তু টবির স্পাইডার-ম্যান মাকড়সার জাল তৈরি করত তার দেহের ভেতরেই, যেটা বেরিয়ে আসত হাত থেকে। বাস্তবে মাকড়সা কিংবা রেশম পোকা যে রকম নিজে নিজে জাল তৈরি করে, সে রকম। এর কোনোটিই বাস্তব সম্ভব বলে আমরা এখনো জানি না, তবে জিন মিউটেশনের কোনো কিছুকে চোখ বুজে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া যায় না।

মার্ভেল সুপারহিরোর জগতে মিউটেশনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ এক্স-মেন। অনেকে অবশ্য তাদের 'মিউট্যান্ট' বলেও ডাকে। বেশির ভাগ সুপারহিরোর মতো তাদেরও ডিএনএ মিউটেশন দেখা যায়। তবে তাদের মিউটেশন কোনো আলাদা দুর্ঘটনা নয়; বরং জন্মপ্রদত্ত। মিউট্যান্টরা তাদের শরীরে আলাদা একটি জিন নিয়ে জন্ম নেয়। অজানা এই জিনকে বলা হয় 'এক্স জিন'। জন্মের সময় 'এক্স জিন' মিউট্যান্টদের শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। একটি নির্দিষ্ট বয়সে এসে এটি শরীরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সেই প্রভাব থেকে শরীরে দেখা যায় বেশ কিছু শারীরিক পরিবর্তন। মূলত স্ট্রেস, হরমোন ও পরিবেশগত কারণে এই মিউটেশন ত্বরান্বিত হয়। অনেকের আবার মিউট্যান্ট জিন সুপ্ত অবস্থাতেই থেকে যায়। ডিএনএ মিউটেশন হলেই নতুন সুপারপাওয়ার লাভ করে মিউট্যান্টরা। জন্মপ্রদত্ত হওয়ায় প্রত্যেকের ডিএনএ মিউটেশন আলাদা। এ কারণে তাদের সুপারপাওয়ারও হয় ভিন্ন ভিন্ন। মার্ভেল কমিকসে এক্স-মেনকে ধরা হয় বর্তমান মানুষের পরের ধাপ। ভবিষ্যতের মানুষ। অনেক মিউট্যান্টই নিজেদের হোমো সুপিরিয়র হিসেবেও দাবি করেন। তবে মূল এক্স-মেনরা তা মনে করে না।

এক্স-মেনের প্রতিটি সদস্যই একেকজন বায়োলজিক্যাল হিরো। কিছু ক্ষেত্রে ভিলেনও। প্রফেসর এক্সকে ধরা হয় তাদের নেতা। বাস্তব জীবনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করলেও তার গোটা শক্তি জমা আছে মস্তিষ্কে। সে মূলত একজন টেলিপ্যাথ, যে কারও মনের কথা বুঝতে পারে, অন্য কারও মস্তিষ্কের ভেতরে বা মানসিকভাবে সরাসরি কথা বলতে পারে। এমনকি সামনে থাকা কাউকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। এককথায়, যে কারও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে নিয়ে নিতে পারে সে।

প্রফেসর এক্সের মস্তিষ্ককে তুলনা করা যায় অ্যাডভান্সড ট্রান্সমিটার বা রিসিভারের সঙ্গে। যেখান থেকে যে কারও সঙ্গে ব্রেন সিগন্যাল আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ করা, এমনকি তাকে দিয়ে যেকোনো কাজও করিয়ে নেওয়া সম্ভব। বাস্তব জীবনে এমন টেলিপ্যাথি সম্ভব নয় বলেই আমরা জানি। অবশ্য হিপনোটাইজেশনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে কারও মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যেতে পারে, তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ীভাবে সম্ভব নয় বলেই জানা যায়। এ নিয়ে অবশ্য অনেক রকম বিতর্কও রয়েছে।

প্রফেসর এক্সের মতো জিন গ্রেও একজন টেলিপ্যাথ। সঙ্গে টেলিকাইনেসিস—দূরের কোনো বস্তুকে চিন্তার মাধ্যমে নাড়িয়ে ফেলার ক্ষমতাও আছে তার। টেলিপ্যাথির মাধ্যমে অন্যের ভাষা বোঝা, মনের খবর জানা, দূর থেকে কথা বলা কিংবা কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে। বাস্তব জীবনে এমনটা সম্ভব নয়, বলা বাহুল্য। তবে হিপনোটিজমের মাধ্যমে মানুষকে বশীভূত করা, তাকে দিয়ে ছোটখাটো কাজ করিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা কিছু দেখা যায়।

তবে বাস্তবের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে এক্স-মেনের জনপ্রিয়তম চরিত্র উলভারিনের। উলভারিনের সব অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে প্রাণিজগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর কাছ থেকে। তার মূল শক্তি হিলিং ফ্যাক্টর। যেকোনো শারীরিক ক্ষতি দ্রুতই কাটিয়ে উঠতে পারে সে। প্রাণিজগতের বেশ কিছু প্রাণী, যেমন এক্সোলোটিস, সালাম্যান্ডার, স্টারফিশ নিজেদের হারানো অঙ্গাণু সময়ের সঙ্গে ফেরত পায়। উলভারিনের মধ্যেও আছে তার বহিঃপ্রকাশ। এ ছাড়া বয়স ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া, অত্যন্ত সক্রিয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের দেখাও মেলে বিভিন্ন প্রাণীতে। এমনকি বিড়ালগোত্রীয় প্রাণীদের মতো খুলতে ও বন্ধ করতে পারে—এমন বড় 'ক্ল' আছে তার। 'ক্ল' শব্দের বাংলা নখর হলেও উলভারিনের এটা ঠিক নখর নয়; বরং হাড়ের মতো, এ কথা বোধ হয় আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। উলভারিনের দেহের প্রতিটি হাড় তৈরি অ্যা ডা মে ন্টি য়া ম নামে প্রচণ্ড শক্ত এবং অবিনাশী এক সংকর ধাতু দিয়ে। কাল্পনিক এই সংকর ধাতু তার শরীরে প্রবেশ করানো হয় একটি অস্ত্রোপচার করে। এখানে দুটি কথা বলা প্রয়োজন। এক, বাস্তব জীবনে এ ধরনের ধাতু শরীরের জিনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে ধাতু দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্রোপচার করা হয় ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য, উলভারিনের



দ্য ইনক্রেডিবল হাল্ক

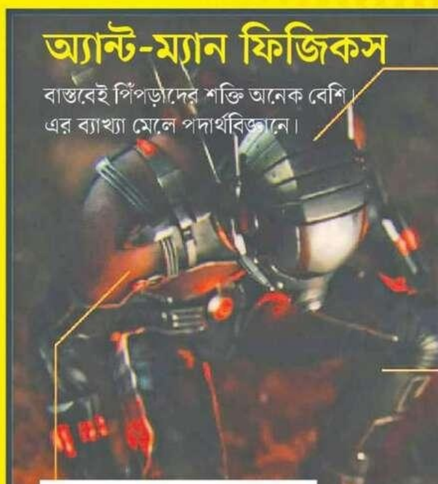
Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

জানেন কি

মার্কিন উদ্ভাবক ও ব্যবসায়ী হাওয়ার্ড হিউসের ওপর ভিত্তি করে আয়রনম্যান চরিত্রটি তৈরি করা হয়েছে?

অ্যান্ট-ম্যান ফিজিকস

বাস্তবেই পিঁপড়াদের শক্তি অনেক বেশি। এর ব্যাখ্যা মেলে পদার্থবিজ্ঞানে।



আয়তন
পেশির আয়তন হিসাব করা হয় এটি কতটা জায়গা নেয়, অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা দিয়ে।

পিঁপড়ার অবিশ্বাস্য শক্তির নেপথ্যে
ছোট প্রাণীদের তুলনায় বড় প্রাণীরা সমানুপাতিকভাবে শক্তিশালী নয়। কারণ, শরীরের আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের তুলনায় তাদের পেশির আয়তন বেড়ে যায়।

উত্তোলন ক্ষমতা
পিঁপড়া তাদের দেহের ওজনের ৫০ গুণ বেশি ওজন তুলতে পারে। কারণ, তাদের পেশি ছোট, কিন্তু পেশির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল অনেক বড়।

শক্তি
একটি পেশির শক্তি সরাসরি তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সাইজ ম্যাটারস!
কোনো প্রাণী যত বড় হয়, তার পেশির আয়তন ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তত বেড়ে যায়। ফলে তারা ভারী ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অতি ক্ষুদ্র, বিপুল শক্তিশালী

বাস্তবের হিগস-বোসন কণা কি অ্যান্টম্যানের 'পিম পার্টিকেল'-এর মতো আচরণ করে

অ্যান্ট-ম্যানের অসাধারণ ক্ষমতার পেছনের মানুষটি হলেন ড. হেনরি পিম। এই বিজ্ঞানী একধরনের উপপারমাণবিক কণা 'পিম পার্টিকেল' আবিষ্কার করেন। এ ধরনের কণা কি বাস্তবে থাকা সম্ভব? হ্যাঁ, কিন্তু বাস্তব বিশ্বের বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য আছে।

২০১২ সালে সার্নের বিজ্ঞানীরা হিগস বোসন কণা শনাক্ত করেছেন। এই মৌলিক কণা হিগস ফিল্ড নামে পরিচিত বিশেষ এক ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই ক্ষেত্রটি বস্তুর ভরের পেছনে বড় ভূমিকা রাখে।

হিগস কণার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে কোনো বস্তুর আকার ছোট বা বড় করা যায় না। কিন্তু কাল্পনিক পিম কণাগুলো হিগস ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব ফেলে এবং ড. পিম তার কণাগুলোকে বদলে নিয়ে কোনো বস্তুকে সংকুচিত বা আকারে বড় করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

আয়রনম্যানের সুপার স্যুট

বাস্তবের এক্সোস্কেলেটন স্যুট সৈন্যদের শক্তি বাড়াতে সক্ষম

যদিও আধুনিক এসব স্যুট আয়রনম্যানের স্যুটের ধারেকাছেও নেই, তবু এগুলো কার্যকর। মার্কিন অস্ত্রনির্মাতা প্রতিষ্ঠান রেথিওন এক্সোএস২ নামে বিশেষ একধরনের স্যুট বানিয়েছে। এর মাধ্যমে সৈন্যরা নিজেদের ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের বস্তু তুলতে পারে, তাতে তারা ক্লান্তও হয় না। এটি হাইড্রোলিক শক্তি ব্যবহার করে। পাশাপাশি এর জোড়াগুলো, বিভিন্ন সেন্সর ও মোটর বিশেষ অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম ও শক্তিশালী ইস্পাতের কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি ভার তুলতে পারে এটি।

বাস্তব এসব স্যুট ফুয়েল সেল নামে একধরনের বিশেষ ব্যাটারিচালিত। অভ্যন্তরীণ দহন প্রক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে। তবে এটি আয়রনম্যানের স্যুটের ক্ষুদ্রাকৃতির আর্ক রিঅ্যাক্টরের মতো নয়। এই রিঅ্যাক্টর টনি স্টার্কের বুকে থাকে, এটিই আয়রনম্যানের স্যুটে শক্তি সরবরাহ করে। এর সবচেয়ে কাছাকাছি জিনিস হলো টোকামাক—একধরনের পরীক্ষামূলক ফিউশন রিঅ্যাক্টর। ডোনাট আকৃতির এই রিঅ্যাক্টর প্রথম শীতল যুদ্ধের সময় তৈরি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যাতে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র উত্তপ্ত প্লাজমাকে আটকে রাখে।

এর ভেতরে, ঠিক সূর্যে যেরকম হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন মিলে হিলিয়াম তৈরি হয়, এরকম ছোট পরমাণু মিলে তৈরি করে বড় পরমাণু। ফলে ব্যাপক শক্তি উৎপন্ন হয়। তবে বিশাল বড় আকারের টোকামাক পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা গেলেও ক্ষুদ্রাকৃতির কোনো টোকামাক এখনো বানানো যায়নি।

টনি স্টারের স্যুটের আর্ক রিঅ্যাক্টরে আমাদের অজানা নতুন একধরনের পরমাণুর ফিউশন ঘটে। এভাবে স্যুটটি শক্তি পায়। এই পরমাণুটি টনি তাঁর বাবা হাওয়ার্ড স্টার্ক আবিষ্কৃত প্রোটন ও নিউট্রন বিন্যাস থেকে পুনরাবিষ্কার করেন।



'আর্ক রিঅ্যাক্টরের সবচেয়ে কাছাকাছি জিনিস হলো টোকামাক—একধরনের পরীক্ষামূলক ফিউশন রিঅ্যাক্টর।'

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



দি অ্যামেইজিং স্পাইডার-ম্যান

বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এটি মেলে না। দুই, বর্তমানে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সে অ্যাডামেন্টিয়াম এসেছে পৃথিবীর বাইরে, মহাজাগতিক প্রচণ্ড ক্ষমতাবান এক প্রাণীর মাধ্যমে। এই কল্পনাও বেশ রোমাঞ্চকর। পৃথিবীর বাইরে থেকে নতুন ধাতুর এসে পড়া চোখ বুজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবে এটিকে বাস্তবও বলা যায় না ঠিক। একটি মজার বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। মহাবিশ্বের প্রায় সব কটি জানা ধাতু ও অধাতু, আসলে সব ধরনের পদার্থই রয়েছে পর্যায় সারণি নামের এক পৃষ্ঠার রাসায়নিকের তালিকায়। বিজ্ঞানীদের জানামতে, এর বাইরে আর কিছু মহাবিশ্বে নেই, অন্তত এখন পর্যন্ত সে রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৫.

ডেয়ারডেভিল তার সুপারপাওয়ার লাভ করেছিল এক দুর্ঘটনা থেকে। সড়ক দুর্ঘটনা থেকে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় ৯ বছর বয়সী ম্যাট মারডক। ট্রাকে থাকা ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে আজীবনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারায় সে। সেই রাসায়নিক প্রবেশ করে ম্যাটের চোখে। ফলে আজীবনের মতো নষ্ট হয়ে যায় তার চোখ। কিন্তু শরীরের একটি ইন্দ্রিয় নষ্ট হলেও অন্য চার ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠে তার ভরসা। অন্য ইন্দ্রিয়গুলো ব্যবহার করে প্রতিদিনের কাজগুলো করতে পারে সে সহজে। আর প্রতিদিনের কাজ শেষে ম্যাট মারডক হয়ে ওঠে ডেয়ারডেভিল।

চোখ নষ্ট হয়ে গেলেও ম্যাটের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই চার ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে ম্যাট নিজের মধ্যে একধরনের 'রাডার সেন্সর' তৈরি করে, যার মাধ্যমে চোখে দেখতে না পেলেও আশপাশের সবকিছু বেশ ভালোভাবে বুঝতে শুরু করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় নিউরোপ্লাস্টিসিটি। যখন মস্তিষ্কের একটি ইন্দ্রিয় পুরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন মস্তিষ্কের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ডেয়ারডেভিলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। চোখে দেখতে না পেলেও তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয় হওয়ার ফলে দ্রুতই সুপারহিউম্যান পাওয়ার লাভ করে সে। সিরিজে ডেয়ারডেভিলকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, বাস্তবে তা একেবারেই অসম্ভব। কল্পবিজ্ঞান ছাড়া কারও পক্ষেই এতটা জেনেটিক্যাল মিউটেশন সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টিশক্তি হারানো মানুষদের মধ্যে শ্রবণক্ষমতা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উচ্চতর সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

৬.

মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের একেবারে নতুন সদস্য হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক ফোরের। মার্ভেলের প্রথম সুপারহিরো পরিবার আবারও একত্র হচ্ছে বড় পর্দায়। মার্ভেলের প্রথম সুপারহিরো পরিবারের চার সদস্যই নিজেদের শক্তি পেয়েছে এক দুর্ঘটনা থেকে। তবে তাদের দুর্ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীর বাইরে, মহাকাশে। মহাকাশযাত্রার সময় মহাজাগতিক রশ্মির মুখোমুখি হয় তারা। প্রাণে বেঁচে ফিরলেও বদলে যায় তাদের ডিএনএ। চার সদস্যই লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা। কিন্তু তাদের কারও ক্ষমতাই বিজ্ঞানসম্মত নয়।

রিড রিচার্ডস বা মিস্টার ফ্যান্টাস্টিক লাভ করে বডি ইলাস্টিসিটি; অর্থাৎ তার শরীর রাবারের মতো লম্বা হতে পারে, যত দূর ইচ্ছা নিজের শরীরকে লম্বা করতে পারে সে, আবার ফিরিয়ে আনতে পারে আগের অবস্থায়। পদার্থবিদ্যা বা জীববিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বেই মানুষ বা কোনো প্রাণীর শরীরে এমনটা ঘটানো সম্ভব নয়। ইনভিজিবল ওম্যান বা সু স্টোর্মের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। পর্দায় যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, শরীরের চারপাশে ফোর্স ফিল্ড তৈরি করে যেকোনো বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে ও অন্যদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটাই সম্ভব নয়। জনি স্টোর্ম বা হিউম্যান টর্চ মুহূর্তেই পরিণত হয় জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে। তার শরীরে আগুনের আঁচও লাগে না এতে। বাস্তবে শরীরে আগুন লাগা তো দূরে থাক, আগুনের সংস্পর্শে এলেই শরীর পুড়ে যাবে। চারজনের মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক সুপারপাওয়ার লাভ করেছে দ্য থিং বা বেন গ্রিম। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে তার চামড়া পরিণত হয় পাথরে। ফলে বাইরের জগতের কাছে সে প্রাণসম্পন্ন পাথর ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও অতিমানবীয় শক্তি ও এন্ডুরেন্স লাভ করে, তবে তার প্রতিদিনের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

এখানেই আসলে শেষ নয়, কমিক বইয়ে আছে আরও অনেক সুপারহিরো। তাদের মতো অতিমানবীয় ক্ষমতা হয়তো আমরা পাব না, কিন্তু সুপারহিরোদের মতো মানুষের পাশে, সত্যের পাশে আমরা দাঁড়াতেই পারি। শুধু ক্ষমতাই যে সব নয়, নিতান্ত সাধারণ মানুষও যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে হয়ে উঠতে পারে অতিমানব, সুপারহিরো, ক্যাপ্টেন আমেরিকার মতো সুপারহিরোরা তা দেখিয়েছে বারবার।

লেখক : শিক্ষার্থী, স্থাপত্য বিভাগ, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

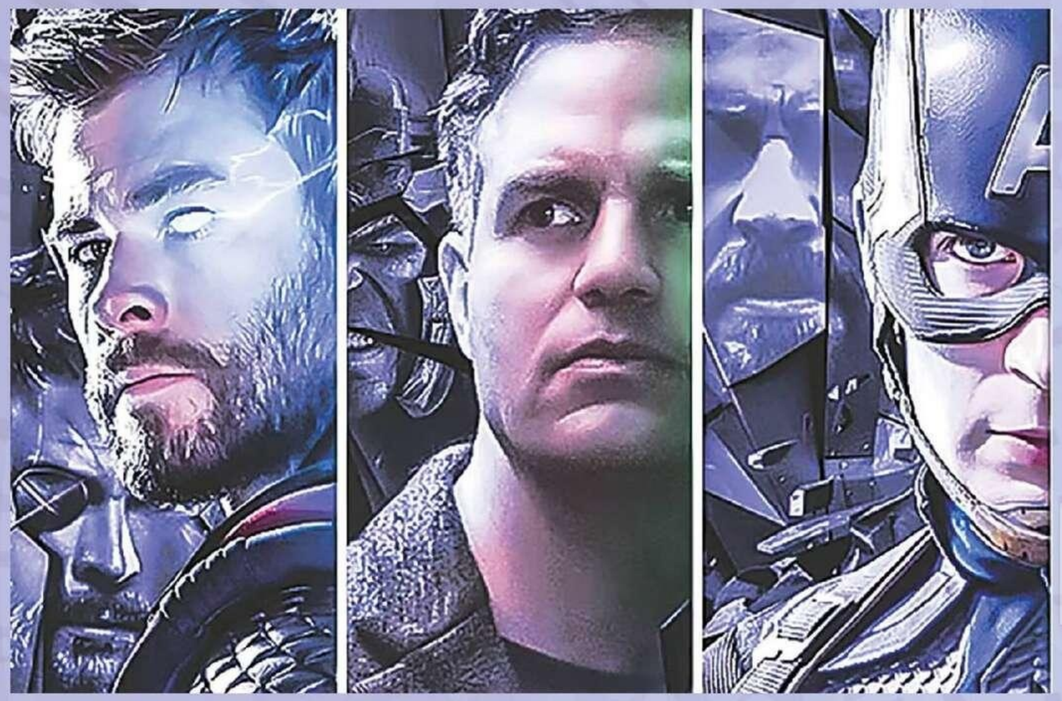
সূত্র : সায়েন্স ওয়ার্ল্ড ডটসিএ, কেমিস্ট্রিভিউজ ডটঅর্গ, উইকিপিডিয়া

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

মলাট কাহিনি

মার্ভেলের সুপারহিরোরা



থর

ক্ষমতা : থর অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এলিয়েন। বৃষ্টি ও বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অসাধারণ সুপারহিউম্যান স্ট্রেন্থের অধিকারী এবং বাইফ্রস্ট ব্যবহার করে মহাবিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেতে পারে।

বিজ্ঞান : বাইফ্রস্ট আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের (একধরনের ওয়ার্মহোল) মতো, যা মহাবিশ্বের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তবে তার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ।

বিজ্ঞান স্কোর : 🔴

পর্যালোচনা : থরের বেশির ভাগ ক্ষমতা ও প্রযুক্তি আসলে পৌরাণিক কাহিনি ও সায়েন্স ফিকশনের অংশ বলা যায়। এর বেশির ভাগই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

হাল্ক (ব্রুস ব্যানার)

ক্ষমতা : ব্রুস ব্যানার 'হাল্ক'-এ রূপান্তরিত হয় মূলত অ্যাড্রেনালিনের কারণে। এতে রাগের বশে একজন সাধারণ মানুষ প্রায় সীমাহীন শক্তির এক দানবে পরিণত হয়।

বিজ্ঞান : বাস্তব জগতে গামা রেডিয়েশন মানুষের কোষ ধ্বংস করে, কোনো সুপারপাওয়ার দেয় না। হাল্কের ব্যাপারটা খানিকটা ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্সের মতো, যেখানে অ্যাড্রেনালিন মানুষের শারীরিক শক্তিকে সাময়িকভাবে বাড়িয়ে তোলে।

বিজ্ঞান স্কোর : 🔴

পর্যালোচনা : হাল্কের এ ধরনের জৈবিক রূপান্তর পদার্থবিজ্ঞানের ভরের নিত্যতা সূত্র এবং রেডিওবায়োলজির কোনো পরিচিত নীতিই মানে না।

ক্যাপ্টেন আমেরিকা (স্টিভ রজার্স)

ক্ষমতা : 'সুপার-সোলজার সিরাম'-এর মাধ্যমে শারীরিক ক্ষমতার চূড়ায় পৌঁছে গেছে স্টিভ রজার্স। এতে তার শক্তি, গতি এবং কোষের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে।

বিজ্ঞান : জিন থেরাপি (যেমন CRISPR) আমাদের ডিএনএতে পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছে। একই উপায়ে মানুষের কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতা উন্নত করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান স্কোর : 🟡

পর্যালোচনা : আমরা এখনো 'সুপার সোলজার' তৈরি করতে পারিনি। তবে হিউম্যান অগমেন্টেশন এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম সম্ভাবনাময় দিক।

সায়েন্স স্কোর ভিজ্যুয়াল স্কেল

🔴 কাল্পনিক	🟡 তাত্ত্বিক/হাইপোথেটিক্যাল	🟢 বর্তমানে বিদ্যমান
থর, হাল্ক, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, স্কারলেট উইচ, ক্যাপ্টেন মার্ভেল, অ্যান্ট-ম্যান	আয়রনম্যান, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, ব্ল্যাক প্যান্থার	আয়রনম্যান, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, ব্ল্যাক প্যান্থার



আয়রনম্যান (টনি স্টার্ক)

ক্ষমতা : টনি স্টার্কের দারুণ এক আর্মার্ড স্যুট আছে। এর সাহায্যে সে সুপারহিউম্যান স্ট্রেন্থ পায়, উড়তে পারে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। এসবই জার্ভিস নামের শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ন্ত্রিত।

বিজ্ঞান : এই স্যুট একধরনের এক্সোস্কেলটন বা কাঠামো, শরীরকে বাড়তি শক্তি দেয় ও নড়াচড়ায় সাহায্য করে। জেট প্রপালশন রয়েছে এতে, যা ফাইটার জেট বা ড্রোনের মতো ওড়ার প্রযুক্তি। আর এআই তো আছেই।

সায়েন্স স্কোর : 🟡 🟢

পর্যালোচনা : এ স্যুটে যে 'আর্ক রিঅ্যাক্টর' দেখানো হয়, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। তবে ডারপার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো রোবোটিকসে প্রতিদিন নতুন উদ্ভাবন করে চলেছে।

হকআই (ক্লিন্ট বার্টন)

ক্ষমতা : লক্ষ্যভেদের দুর্দান্ত দক্ষতা রয়েছে তার। প্রায় অসম্ভব নিখুঁতভাবে তির ছোড়ে। ঝুলিতে থাকে নানা রকম হাইটেক ট্রিক অ্যারো, যেমন বিস্ফোরক তির, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস (EMP) তির, গ্র্যাপলিং হুক ইত্যাদি।

বিজ্ঞান : হকআইয়ের পুরো কৌশল দাঁড়িয়ে আছে প্রজেক্টাইল মোশন (প্রাস বা ক্ষেপণাস্ত্র) নিয়ে অসাধারণ দক্ষতার ওপর। তার প্রতিটি ট্রিক অ্যারোই আসলে স্মার্ট অস্ত্র—আধুনিক প্রযুক্তিতে যেভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির স্মার্ট মিসাইল বা বিশেষ ওয়ারহেড বানানো হয়, সে রকম।

সায়েন্স স্কোর : 🟢

পর্যালোচনা : হকআইয়ের ক্ষমতা বাস্তব দক্ষতার খুব ভালো উদাহরণ। তার ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো আজকের বিজ্ঞানে ভালোমতোই সম্ভব—শুধু দামটা চড়া।

ব্ল্যাক উইডো (নাতাশা রোমানফ)

ক্ষমতা : শারীরিকভাবে অত্যন্ত দক্ষ, গোয়েন্দা কার্যকলাপে পারদর্শী এবং মার্শাল আর্টে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এসব দক্ষতা ও সক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তোলে বিভিন্ন আধুনিক গ্যাজেট। যেমন 'উইডোজ বাইট', যা শত্রুকে ইলেকট্রিক শক দিতে পারে।

বিজ্ঞান : ব্ল্যাক উইডোর সব ক্ষমতাই মানুষের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার সীমার মধ্যে রয়েছে। তার গ্যাজেটগুলোও আজকের বিজ্ঞানে পুরোপুরি সম্ভব।

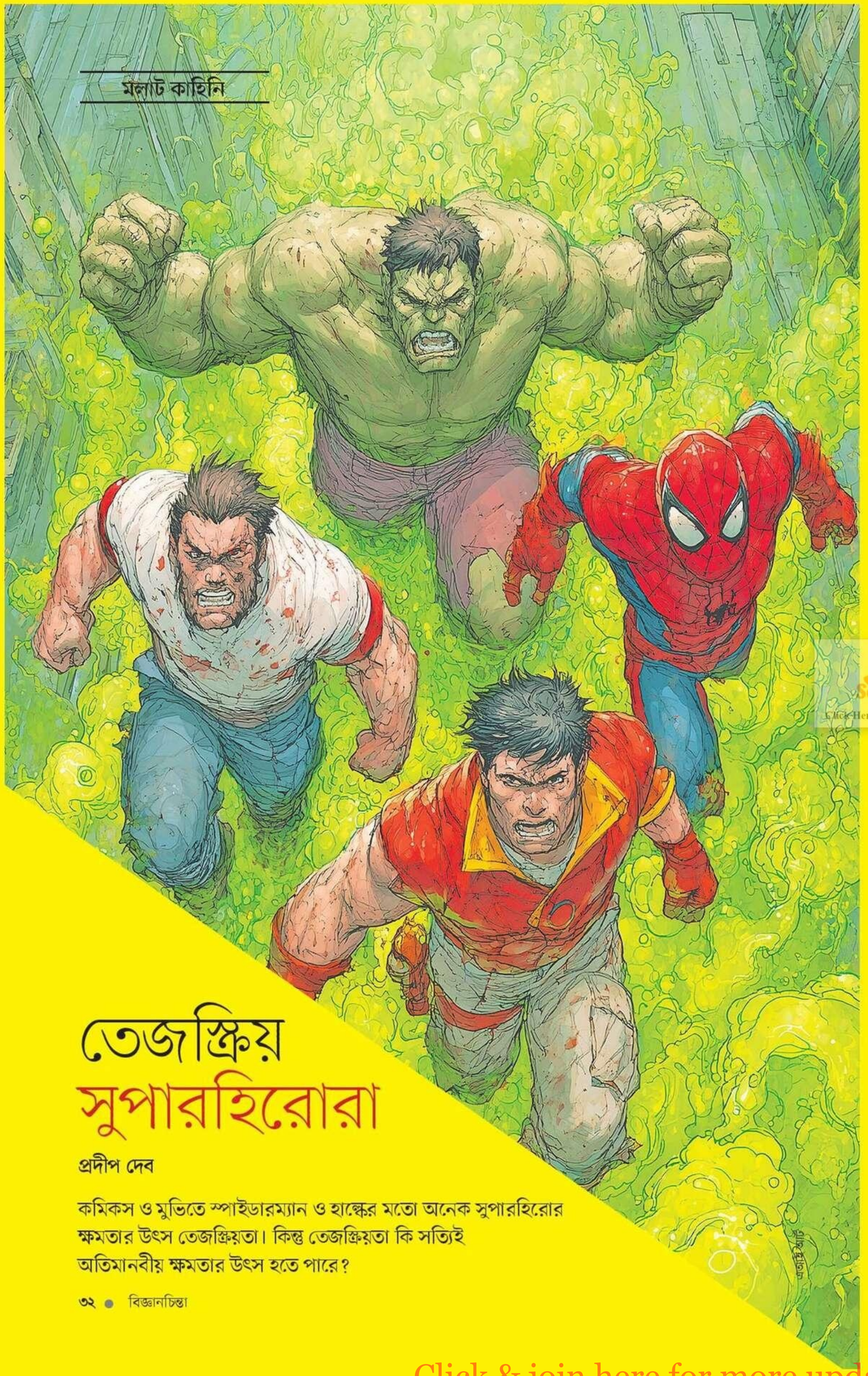
বিজ্ঞান স্কোর : 🟢

পর্যালোচনা : বাস্তব প্রযুক্তি, দক্ষতা ও অনুশীলনের চমৎকার উদাহরণ সে।

গ্রন্থনা : শিবলী বিন সারওয়ার

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



মলাট কাহিনি

তেজস্ক্রিয় সুপারহিরোরা

প্রদীপ দেব

কমিকস ও মুভিতে স্পাইডারম্যান ও হাল্কের মতো অনেক সুপারহিরোর ক্ষমতার উৎস তেজস্ক্রিয়তা। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা কি সত্যিই অতিমানবীয় ক্ষমতার উৎস হতে পারে?

মার্ভেল-ভক্তরা সবাই ব্রুস ব্যানারকে চেনেন। মানুষটা নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী, তার ওপর 'ডক্টর' অর্থাৎ পিএইচডি। তার দ্বিতীয় সত্তা হাল্ক প্রচণ্ড শক্তিশালী এক দৈত্য। রেগে গেলেই ব্রুস ব্যানার মানুষ থেকে 'দৈত্য' হয়ে ওঠে, ভেঙে তছনছ করে ফেলে সব। এই চরিত্র একটুখানি বিজ্ঞানের সঙ্গে, অনেকখানি কল্পনার মিশেলে তৈরি। এ রকম আরও অনেক সুপারহিরো-সুপারভিলেন রয়েছে কমিক বই, গল্প, উপন্যাস, মুভি, টিভি ও ওটিটি সিরিজে।

কমিকের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৯৭ সালে, *দ্য ইয়েলো কিড ইন ম্যাকফ্যাডেনস ফ্ল্যাটস* প্রকাশের মাধ্যমে। কল্পবিজ্ঞানের প্রথম সুপারহিরো সুপারম্যান। ১৯৩৮ সালে শুরু হয়েছিল এই সুপারহিরোর যাত্রা। সেই সময় পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে অভিযান শুরু করার লক্ষ্যে নভোযান প্রস্তুত করছিলেন। তারই প্রতিফলন ঘটে সে সময়ের এ রকম বেশ কিছু চরিত্রে।

সুপারম্যানের জন্ম ক্রিপটন নামের এক কাল্পনিক গ্রহে। গ্রহটি লাল নক্ষত্র রাওয়ের চারপাশে ঘোরে। ক্রিপটনের বিজ্ঞানী দম্পতি জর-এল ও লারা যখন দেখে তাদের গ্রহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা ছোট একটি মহাকাশযান তৈরি করে নিজেদের একমাত্র সন্তান কাল-এলকে সেখানে তুলে দেয়। এরপর ক্রিপটন ধ্বংস হয়ে যায়। মহাকাশের নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে কাল-এল এসে পৌঁছায় পৃথিবীতে। এখানে সে পেয়ে যায় প্রচণ্ড শক্তি, দুর্বার গতি, ওড়ার ক্ষমতা, এক্স-রে দৃষ্টি; হয়ে ওঠে আমাদের সুপারম্যান।

সুপারম্যানের জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একের পর এক তৈরি হতে থাকে নতুন নতুন সুপারহিরো ও সুপারভিলেন। ডিসি কমিকসের সুপারগার্ল কিংবা মার্ভেলের ক্যাপ্টেন আমেরিকা, স্পাইডারম্যান, হাল্ক—তাদের অনেকেই শারীরিকভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের অনেক নিয়মই তাদের ক্ষেত্রে খাটে না। তারা মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করতে পারে। নিউটনের গতিসূত্র বা শক্তির সংরক্ষণশীলতার ক্ষমতা নেই তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার। কোয়ান্টাম মেকানিকসের তাত্ত্বিক টানেলিং বা এনট্যাঙ্গলমেন্টের অসম্ভবকে তারা বাস্তবেই কাজে লাগায় অবলীলায়।

এ রকম বেশ কিছু সুপারহিরোর অফুরন্ত শক্তির উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প তৈরি করতে গিয়ে বিকিরণবিজ্ঞানের অপব্যবহার করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

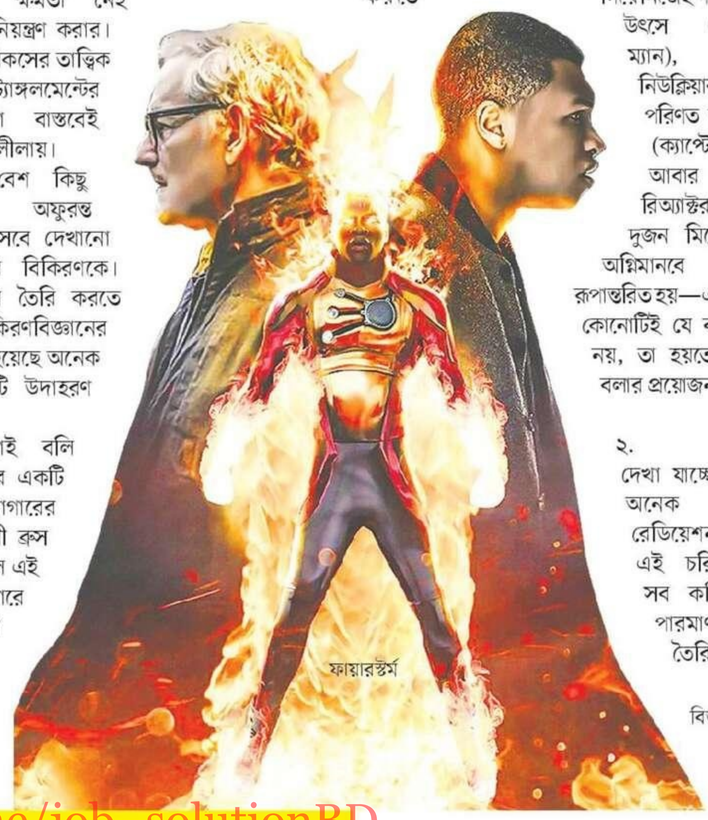
হাল্কের কথাই বলি প্রথমে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারি গবেষণাগারের নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী ব্রুস ব্যানার। দায়িত্বশীল এই মানুষ গবেষণাগারে একটি 'গামা বোমা' তৈরি করছিল। বোমার কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করার সময় সে দেখে, বিপৎসীমার মধ্যে হঠাৎ এসে পড়েছে এক তরুণ। রিক জোনস নামের এই তরুণকে বাঁচাতে গিয়ে বোমার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয় ব্রুস। তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মির প্রভাবে তার শরীরের কোষ ও স্নায়ুকোষের ডিএনএ এমনভাবে বদলে যায় যে সে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেই সেরেছে! শরীরের সব কটি পেশি এমনভাবে ফুলে ওঠে যে সে প্রচণ্ড শক্তিশালী সবুজ দৈত্য 'হাল্ক'-এ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। রাগ যত বাড়তে থাকে, তার বিধ্বংসী ক্ষমতাও তত বাড়ে।

বিজ্ঞানের বাস্তবতার সঙ্গে এই গল্প মেলাতে গেলে সমস্যা। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে শরীরের ডিএনএর পরিবর্তন ঘটতে পারে, এটা সত্য। কিন্তু বিকিরণের ফলে ও রকম দৈত্যে পরিণত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে কী হতে পারে? এ নিয়ে একটু পরে বিস্তারিত বলছি।

এ রকম আরেকটি বিখ্যাত উদাহরণ স্পাইডারম্যান। স্কুলছাত্র পিটার পার্কারকে একটি তেজস্ক্রিয় মাকড়সা কামড়ে দেয়। ফলে সেই তেজস্ক্রিয় মাকড়সার পরিবর্তিত ডিএনএ পিটারের শরীরে প্রবেশ করে। তাতে পিটারের ভেতর প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হয়। মাকড়সার মতো সে খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে। কমিকসভেদে কখনো দেখা যায় তার দেহে মাকড়সার জাল তৈরি হয়, কখনো আবার সে মাথা খাটিয়ে 'ওয়েব শুটার' নামের বিশেষ যন্ত্র দিয়ে শক্তিশালী জাল বানিয়ে ঝুলে থাকতে পারে।

এই গল্পেও বিজ্ঞানের মারাত্মক অপব্যবহার করা হয়েছে। মারাত্মক বিষধর মাকড়সার কামড়ের বিষক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু মানুষ মাকড়সার ক্ষমতা পেতে পারে না।

এ রকম আরও বেশ কিছু চরিত্র আছে, যেমন রেডিওঅ্যাকটিভ ম্যান, ডক্টর ম্যানহাটান, ফায়ারস্টর্ম, ক্যাপ্টেন অ্যাটম, দ্য লিডার ইত্যাদি। তাদের কেউ নিজেকে জীবন্ত নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে নিজেই পরিণত হয় বিকিরণ উৎসে (রেডিওঅ্যাকটিভ ম্যান), কেউ আবার নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে পরিণত হয় ধাতব মানবে (ক্যাপ্টেন অ্যাটম); আবার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বিস্ফোরণে দুজন মিলেমিশে একজন অগ্নিমানবে (ফায়ারস্টর্ম) রূপান্তরিত হয়—এমনও আছে। এর কোনোটিই যে বাস্তবে বৈজ্ঞানিক নয়, তা হয়তো আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই।



ফায়ারস্টর্ম

২.

দেখা যাচ্ছে, কল্পবিজ্ঞানের অনেক সুপারহিরোই রেডিয়েশন প্রভাবিত। এই চরিত্রগুলোর প্রায় সব কটি সৃষ্টি হয়েছে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রতিযোগিতার

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

শীতল যুদ্ধের সময়। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলে যুক্তরাষ্ট্র যে ধ্বংস যুগের সূচনা করেছিল, তারই পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে এসব সুপারহিরো-সুপারভিলেনের ওপর।

সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, নিউক্লিয়ার শক্তির ধ্বংসাত্মক পরিণতি বোঝানোর জন্য বিজ্ঞানকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এসব ক্ষেত্রে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো যে রকম যুদ্ধে মেতে ওঠে, তারই রূপক প্রতিফলন দেখানো হয়েছে এখানে কল্পবিজ্ঞানের আড়ালে।

সামাজিক উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শক্তি, ধর্ম ও ক্ষমতাকে এভাবে অতিরঞ্জিত করে এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভুলভাবে উপস্থাপন করে যে সুপারহিরো ও সুপারভিলেনের চরিত্রগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য বিনোদন। কিন্তু এই বিনোদন পরোক্ষভাবে নিউক্লিয়ার শক্তি ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা তৈরি করেছে।

এসব চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে শরীরের ডিএনএ পরিবর্তিত হয়ে অদ্ভুত ক্ষমতার উৎপত্তি হয়েছে। মানুষ দৈত্যের শক্তিপ্রাপ্ত হচ্ছে, ওড়ার ক্ষমতা অর্জন করছে ইত্যাদি। কল্পবিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানের যথেচ্ছ অপব্যবহার করা হয়েছে এসব কাহিনিতে। তাই প্রশ্ন আসে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সত্যিকারের বিজ্ঞান তাহলে কী?

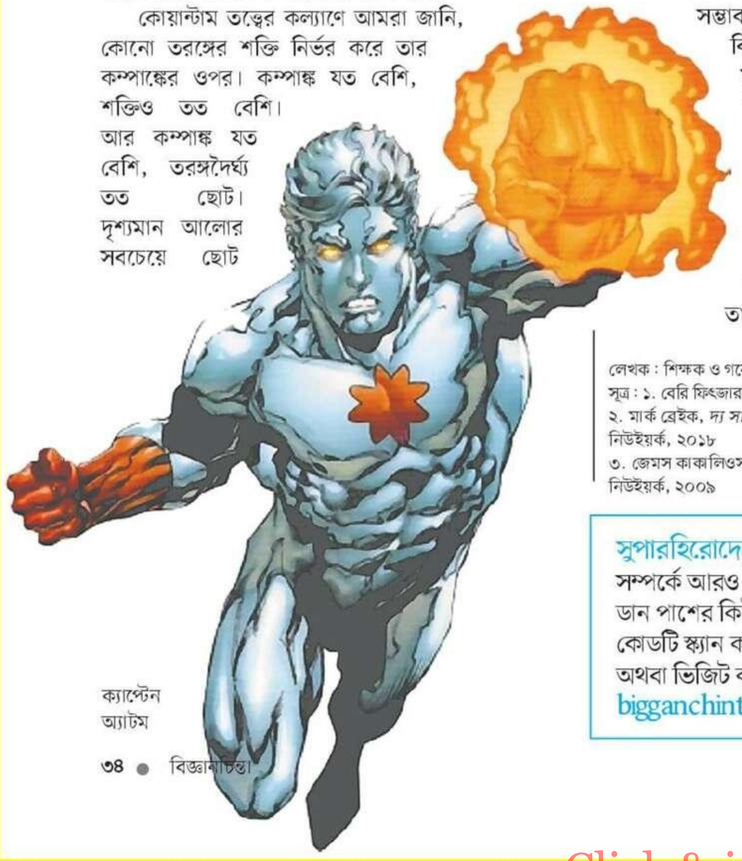
বিকিরণ হলো শক্তির প্রবাহ। বিকিরণ প্রধানত দুই ধরনের হতে পারে—কণাপ্রবাহ ও তরঙ্গপ্রবাহের মাধ্যমে। ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফা—এ রকম কণা যখন তাদের স্থিতিশীল শক্তিস্তরে থাকার জন্য যেটুকু শক্তির দরকার হয়, তার চেয়ে বেশি শক্তি বহন করে, তখন অন্য কোনো পদার্থের সংস্পর্শে এলে সেই অতিরিক্ত শক্তির প্রভাবে পদার্থের আয়নাইজেশন বা আয়নায়ন ঘটায়। এরপরও যেটুকু শক্তি বাকি থাকে, তা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ আকারে বিকীর্ণ হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের কল্যাণে আমরা জানি, কোনো তরঙ্গের শক্তি নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের ওপর। কম্পাঙ্ক যত বেশি, শক্তিও তত বেশি। আর কম্পাঙ্ক যত বেশি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত ছোট। দৃশ্যমান আলোর সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বেগুনি। তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও ছোট হলে হয় অতিবেগুনি। অতিবেগুনি রশ্মির চেয়েও ছোট হলো এক্স ও গামা রশ্মি। এক্স-রে তৈরি হয় পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর কক্ষপথ থেকে। গামা রশ্মি নির্গত হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে—প্রোটন বা নিউট্রনের শক্তিস্তরের উত্তেজনা থেকে। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে গামা রশ্মি নির্গমন করে।

এক্স-রে বা গামা-রে আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে তার কতটুকু শরীর শোষণ করবে, কতটুকু বের করে দেবে, তা নির্ভর করে রশ্মিগুলোর শক্তির ওপর। এসব রশ্মি শোষণের ফলে কোনো প্রাণীর শরীর বা কোনো পদার্থই দীর্ঘ সময়ের জন্য তেজস্ক্রিয় বা রেডিওঅ্যাকটিভ হয়ে পড়ে না। সে জন্য শরীরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রবেশ করতে হয়।

এবার দেখা যাক, বিকিরণের প্রভাবে শরীরে কী কী ক্ষতি হতে পারে। অতিরিক্ত বিকিরণ শরীরে প্রবেশ করলে জীবকোষের নিউক্লিয়াসে যে ডিএনএ আছে, তার বন্ধন ভেঙে যেতে পারে। কম পরিমাণে ভাঙলে ডিএনএগুলো নিজেদের মেরামত করতে পারে। কিন্তু বেশি ভেঙে গেলে কোষ মরে যায়। খুব বেশি কোষ একসঙ্গে মরে গেলে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়, অঙ্গ কার্যকারিতা হারায়। আর বেশির ভাগ কোষ দ্রুত মরে গেলে মানুষ মারা যেতে পারে। কিন্তু বিকিরণের প্রভাবে মানুষ কিছুতেই নিজে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন হয়ে উঠতে পারে না।

কোষের ডিএনএগুলোর বন্ধন যদি ভেঙে যায়, শরীরের স্বয়ংক্রিয় মেরামতপদ্ধতির মাধ্যমে শরীর সেই ভগ্নবন্ধন জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা করে। জোড়া লাগাতে গিয়ে অনেক সময় কিছু উল্টো ব্যাপার ঘটতে পারে। তাতে অনেক সময় ডিএনএর ত্রুটি নিয়ে কোষ বিভাজন ঘটে। ফলে ক্যানসার কোষের উৎপত্তি হতে পারে। বিকিরণের প্রভাবে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা এখান থেকেই তৈরি হয়। কিন্তু বিকিরণের প্রভাবে কোনোভাবেই 'হাল্ক' বা 'স্পাইডারম্যান' হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মস্তিষ্কের কোষ যদি অতিরিক্ত বিকিরণ শোষণ করে, তাহলে নিউরনের মৃত্যু ঘটে। মস্তিষ্ক কার্যক্ষমতা হারাতে পারে। কিন্তু উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ বিকিরণের প্রভাবে মানুষ কখনো হঠাৎ বোকা থেকে অতিবুদ্ধিমান হয়ে উঠবে না। কল্পনার সুপারহিরোদের কার্যক্ষমতাকে আমরা যতক্ষণ গল্পের জায়গায় রেখে দেব, বিনোদিত হব, ততক্ষণ কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু তাকে বিজ্ঞানের জায়গায় রাখা ঠিক হবে না।



ক্যাপ্টেন অ্যাটম

লেখক : শিক্ষক ও গবেষক, আরএমআইটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

সূত্র : ১. বেরি ফিৎজারাল্ড, *ফিজিকস এডুকেশন*, সংখ্যা ৫৪, ০১৫০১৯ (২০১৯)
২. মার্ক ব্রেইক, *দ্য সায়েন্স অব সুপারহিরোস*, রেসহর্স পাবলিশিং, নিউইয়র্ক, ২০১৮
৩. জেমস কাকালিওস, *দ্য ফিজিকস অব সুপারহিরোস*, গথাম বুকস, নিউইয়র্ক, ২০০৯

সুপারহিরোদের সম্পর্কে আরও জানতে ডান পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন : bigganchinta.com

সুপারম্যাটেরিয়ালস

বাস্তব জীবনের কোন পদার্থগুলো কমিক বইয়ে দেখানো বিশেষ পদার্থগুলোর কাছাকাছি?

উরু

এই ধাতু শুধু নর্স দেবতাদের আবাসস্থল আসগার্ডে পাওয়া যায়। এর ফলে এর ঘনত্ব এবং দৃঢ়তা মহাবিশ্বে অনন্য হয়ে ওঠে এবং এটি থরের হাতুড়ি, মিওলনির (Mjolnir) মতো জাদুকরি জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর শব্দগুলোও জাদুকরি মনে হয়, যদিও গল্পটির কিছু বাস্তবতার সঙ্গে মিল আছে।

একটি তারার কেন্দ্রে, পরমাণুগুলো শক্তিশালী পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ায় (nuclear reactions) মিশে যায়, ভারী উপাদানের ফর্ম তৈরি করে। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সম্ভবত এই তারার নিউক্লিয়াসে বা অন্যান্য অদৃশ্য চুল্লিতে তৈরি হয়েছিল, অথবা যখন বিশাল তারাগুলো মারা যায়, তখন বিস্ফোরিত হয়েছিল।



ক্রিপ্টোনাইট

ক্রিপ্টোনাইট সুপারম্যানের জন্মভূমি ক্রিপ্টন গ্রহের একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান। বাস্তবে 'ক্রিপ্টন' নামে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে, যার সঙ্গে ক্রিপ্টোনাইটের কোনো সম্পর্ক নেই। *সুপারম্যান রিটার্নস* মুভি অনুযায়ী, ক্রিপ্টোনাইট আসলে লিথিয়াম বোরন সিলিকেট হাইড্রোক্সাইড ও ফ্লুরিনের মিশ্রণে তৈরি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ২০০৭ সালে বিজ্ঞানীরা কাছাকাছি একটি উপাদান তৈরি করেছেন বলে জানিয়েছেন। এর নাম জাদারাইট।

এটি অবশ্য পুরোপুরি ক্রিপ্টোনাইটের মতো নয়। এতে ফ্লুরিন নেই এবং এটি তেজস্ক্রিয় নয়। সাদা রঙের এই যৌগ অতিবেগুনি আলোয় লালচে-কমলা হয়ে ওঠে।



ভাইব্রেনিয়াম

ইস্পাতের চেয়েও শক্তিশালী এবং হালকা, ভাইব্রেনিয়ামের রয়েছে যেকোনো ধরনের আঘাত শোষণের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা।

বাস্তবে রাবারের রয়েছে স্থিতিস্থাপক ক্ষমতা, টেনে ছেড়ে দিলে আগের জায়গায় ফিরে আসে। ওদিকে মধুর রয়েছে সান্দ্রতা। এই দুইয়ে মিলে কোনো পদার্থ বানালে তা প্রবল আঘাতও শোষণ করতে পারার কথা। বাস্তবে পলিমার ও সিরামিক আঘাত শোষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও সেগুলো ভাইব্রেনিয়ামের ধারেকাছে নেই।



অ্যাডামান্টিয়াম

অ্যাডামান্টিয়াম মার্ভেল বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন ও টেকসই ধাতুগুলোর মধ্যে অন্যতম। এমসিইউতে সেলেস্টিয়াল আইল্যান্ড এই পদার্থ দিয়ে তৈরি। উলভারিনের 'ক্লু'তেও এই পদার্থ রয়েছে। বাস্তবে এর সবচেয়ে কাছাকাছি হলো টাইটেনিয়াম। অত্যন্ত ঘাতসহ এই পদার্থ মানবকোষের ক্ষতি করে না। সঠিক মেকানিক্যাল বৈশিষ্ট্য, আকার-আকৃতি এবং পৃষ্ঠতলের শক্তদশা তৈরি করা গেলে এর সঙ্গে হাড়ের শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করা সম্ভব।



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

কমিকস

কী ও কেন?

বাঁ পাশ ফিরে ঘুমাব, না ডান পাশ?

আব্দুল কাইয়ুম আঁকা : **অনিন্দ্য মুস্তাসির**





Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

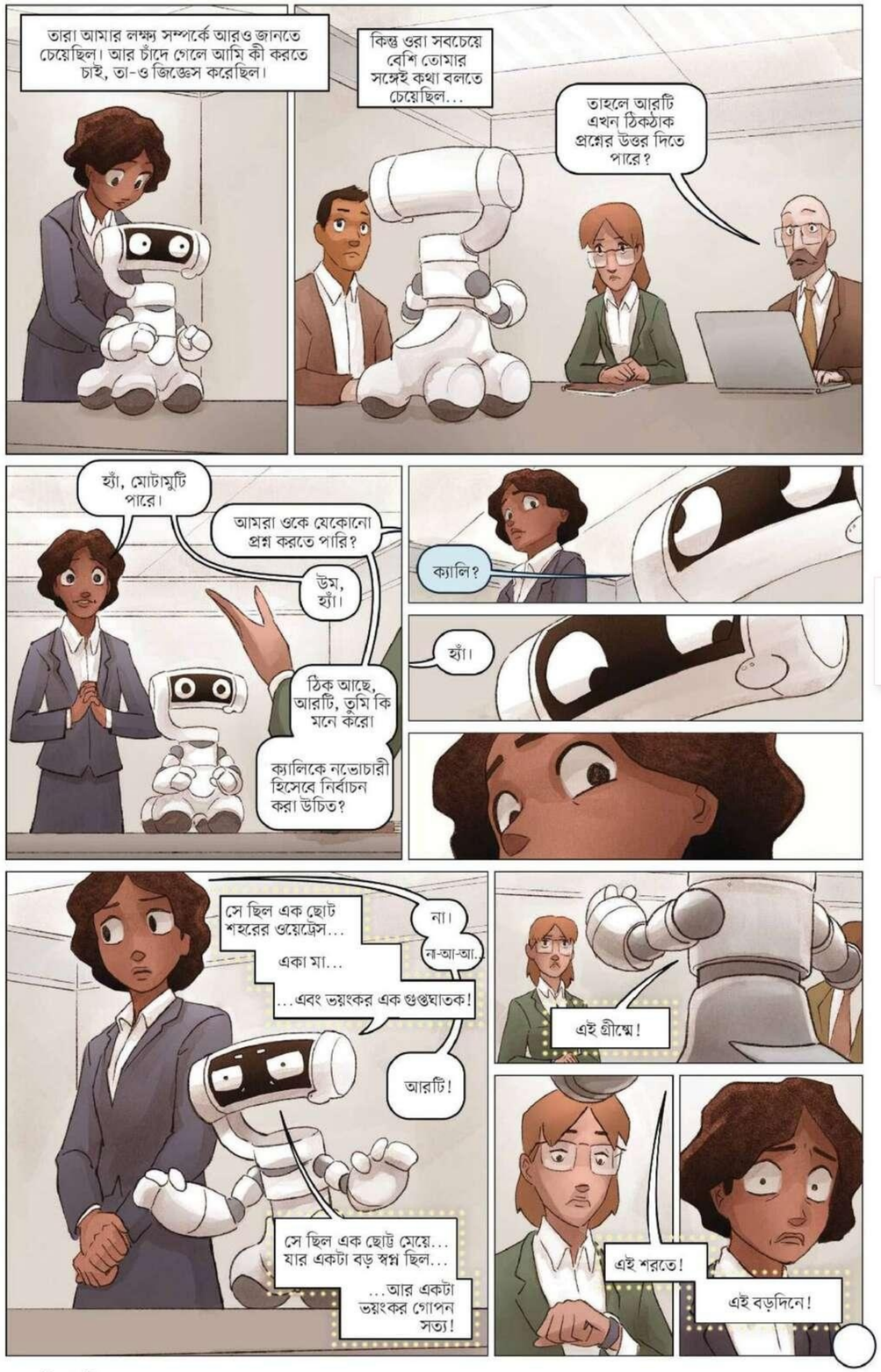
কমিকস

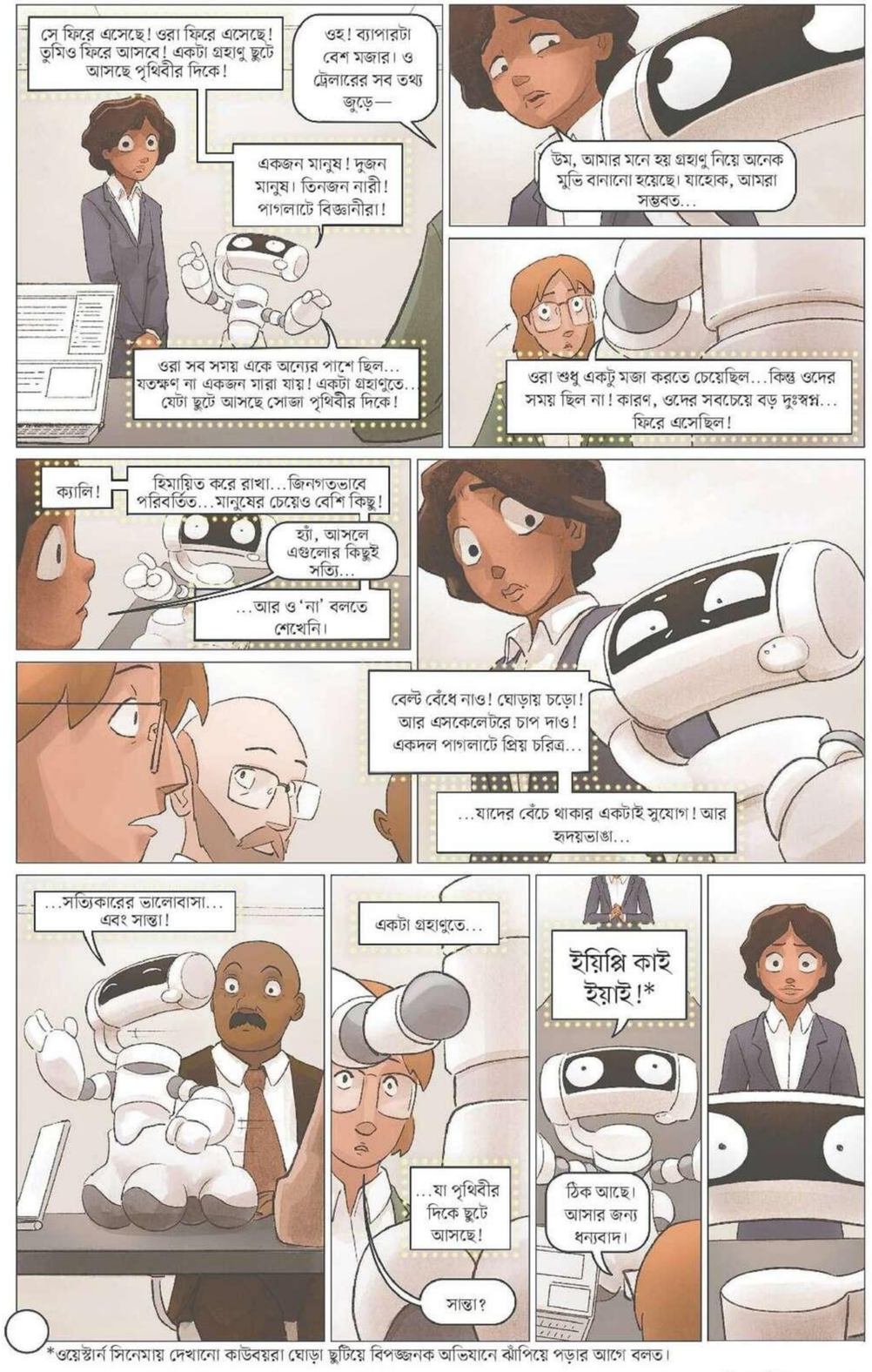


চন্দ্রজয়ী প্রথম নারী

পর্ব : ১১

ব্রাড গান ও স্টিভেন লিস্ট | ভাষান্তর : কাজী আকাশ
আঁকা : ব্রেন্ট ডোনোহোর ও কেইটলিন রিড





*ওয়েস্টার্ন সিনেমায় দেখানো কাউবয়রা ঘোড়া ছুটিয়ে বিপজ্জনক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বলত।

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



চলবে...



বিজ্ঞানায়োজন

এআই রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞান বক্তৃতা আয়োজিত

এআই নিয়ে আয়োজিত হলো বিজ্ঞান বক্তৃতা। গত ২৬ জুন, বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলামোটরের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

এ আয়োজন শুরু হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে চারটায়। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের স্বাগত জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞান বক্তৃতা শুরু করেন সঞ্চালক তথাপি আজাদ। শুরুতেই মঞ্চে ডেকে নেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুমকে। সম্পাদক তাঁর শৈশবের মজার কথা দিয়ে শুরু করেন। বিজ্ঞানচিন্তা আয়োজিত এ বক্তৃতায় আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই হয়তো বিজ্ঞানী হব না, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতেই হবে। তাহলেই আমরা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারব। দেশ এবং সমাজকেও সামনে এগিয়ে নিতে পারব।'

এরপর মঞ্চে আসেন আলোচক বাংলাদেশ এআই অলিম্পিয়াড টিমের দলনেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন। শুরুতে তিনি আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের দুটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক পাওয়ার সাফল্য নিয়ে কথা বলেন। এআই কীভাবে কাজ করে, কীভাবে আমরা এআই ব্যবহার করতে পারি, এআই আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারে, কোথা থেকে আমরা বিনামূল্যে এআই শিখতে পারি—এসব বিষয় সহজ ভাষায় উঠে আসে তাঁর বক্তৃতায়।

এরপর মঞ্চে ওঠেন ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড ও ঢাকা এআই ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ অলি আহাদ। তিনি প্রজেক্টরের সাহায্যে মজার ভিডিও এবং কিছু স্লাইড দেখান। এতে আগত পাঠকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কে বুঝতে সুবিধা হয়। তাঁর কথায় উঠে আসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর গবেষণার কথা। সবাইকে এআইয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আশা দেখান তিনি।

মূল আলোচনার পর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। দুই আলোচক এই পর্বে পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। পর্বটি পরিচালনা করেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদনা দলের সদস্য শিবলী বিন সারওয়ার। দর্শকরা অনেক মজার মজার প্রশ্ন করেন। ধৈর্য ধরে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন দুই আলোচক। যেমন এআই কি ভবিষ্যতে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে? এআইয়ের কারণে কি মানুষের চাকরি চলে যাবে? বাংলাদেশে এআই গবেষণার অগ্রগতি কতটা হলো? কীভাবে এআই নিয়ে কাজ শুরু করব? একের পর এক এমন প্রশ্ন আসতে থাকে। সময় ফুরিয়ে আসে, তবু দর্শকদের প্রশ্ন ফুরোয় না। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য বাধ্য হয়ে ইতি টানতে হয় প্রশ্নোত্তর পর্বের। যারা প্রশ্ন করেছেন, তাঁদের সবাইকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় বিজ্ঞানচিন্তা।

এরপর উপস্থিত দর্শকদের জন্য শুরু হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য ছিল বিজ্ঞানচিন্তার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার। মোট ১১ বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

সবশেষে অতিথি ও বিজয়ীদের ফটোসেশনে অংশ নেয় বিজ্ঞানচিন্তা টিম। পাঠক-লেখক-শ্রোতাদের হাসি আলাপের মাধ্যমে শেষ হয় এই মিলনমেলা।

এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, বিজ্ঞান বক্তা আসিফসহ আরও অনেকে।

বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

‘বিরল গোলাপি হাতির দল রক্ষায় আমাদের অক্ষমতা যেন জয়ী না হয়’

—এম এ আজিজ
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এম এ আজিজ ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে বন্য প্রাণী গবেষণা ও সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি আইইউসিএনের এশিয়ান হাতি বিশেষজ্ঞ দলের সক্রিয় সদস্য। এম এ আজিজ ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্য সরকারের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব কেন্ট থেকে সুন্দরবনের বাঘের জিনতত্ত্ব ও পপুলেশনের ওপর পিএইচডি করেন। তাঁর গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৮ সালে ইউনিভার্সিটি অব কেন্ট তাঁকে ডারেল ট্রাস্ট ফর কনজারভেশন বায়োলজি পুরস্কার দেয়। দেশের বন্য প্রাণী গবেষণা ও সংরক্ষণে অবদান রাখায় তিনি আরও বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। এশিয়ান হাতি, মেছো বিড়াল, বাদুড়, নদীর শুশুক, সুন্দরবনের বাঘ, কুমির ও হরিণ নিয়ে নানা গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন এম এ আজিজ। তিনি বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

সম্প্রতি রাঙামাটির বনে একটি গোলাপি হাতির দেখা পেয়েছেন এম এ আজিজ। বিরল এ ঘটনাসহ বাংলাদেশে বন্য হাতির জীবনচিত্র নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন লেখক ও সাংবাদিক **কাজী আলিম-উজ-জামান**।



Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বিজ্ঞানচিন্তা : সম্প্রতি রাঙামাটির বনে গোলাপি হাতি দেখা গেছে। আপনি কীভাবে খবরটি পেয়েছেন?

এম এ আজিজ : গত ১৩ জুন রাতে ফেসবুকে রাঙামাটির কাপ্তাই লেকে হাতির একটি দলের সাঁতরানোর ছবি নজরে আসে। পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের সাবেক বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রেজাউল করিম চৌধুরী ফেসবুকের হাতির ভিডিওটি আমার হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেন। ভিডিওটি বেশি ভালো মানের না হলেও হাতির দলের সঙ্গে ছোট্ট একটি শাবকের গায়ের রং কিছুটা আলাদা মনে হয়েছে। বেশ কয়েকবার ভিডিওটি দেখে নিশ্চিত হলাম, শাবকটি অন্যান্য হাতির চেয়ে আলাদা। ফলে রাঙামাটি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ঈদের ছুটির পর ১৫ জুন প্রথম অফিস হওয়ায় দোদুল্যমানতা কাজ করে। তবে বিষয়টি মাথায় ঘুরতে থাকে। ১৫ তারিখ অফিস শেষে বাসায় ফিরে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিই, রাতেই রাঙামাটি যাব। এরই মধ্যে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে। আমার ল্যাবে গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন আমীর হামজা। তিনিও সানন্দে রাজি হলেন।

কোনোরকমে ক্যামেরা ও ব্যাগ গুছিয়ে রওনা হলাম। পথে থাকতেই সংশ্লিষ্ট বন অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, কীভাবে ওই হাতির এলাকায় সহজে যাওয়া যায়। তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। রাতেই ঠিক করে রাখা হলো রাঙামাটি থেকে গন্তব্যে যাওয়ার স্পিডবোট ও স্থানীয় গাইড; সঙ্গে বন বিভাগের একজন কর্মকর্তাও থাকবেন আমাদের সঙ্গে। রাত সাড়ে ১০টার বাসে উঠে বসলাম ঢাকার কলাবাগান থেকে। রাঙামাটি শহরের বনরুপায় সকাল ছয়টায় আমাদের বাস পৌঁছাল। সেখান থেকে আমরা ছুটলাম শুবলং বন অফিসের দিকে। প্রায় ৪০ মিনিট লাগল। বন অফিসের ফরেস্টার শরিফুল আমাদের দেখে কিছুটা অবাক হলেন। কীভাবে এত সকালে আমরা এই দুর্গম এলাকায় পৌঁছে গেলাম! কিছু পানির বোতল ও হালকা খাবার কিনে স্পিডবোটে আবার ছুটলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। প্রায় ৩০ মিনিটে পৌঁছে গেলাম দুর্গম পাহাড়ি টিলাসমেত নানা ফলের বাগানসমৃদ্ধ এলাকায়। টিলাগুলোর মধ্যে দু-একটি বাড়িঘরও আছে। চারপাশে পানি আর পানি।

আমরা গিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের এক মেম্বারের বাড়িতে উঠলাম। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন গাইড। তাঁরা এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের সদস্য। পরিচয় পর্ব শেষ করে আমাদের নিয়ে চললেন বনের দিকে। প্রায় আধা ঘণ্টা পর পেয়েও গেলাম হাতির দলটি। কিন্তু গাছপালার জন্য দু-একটি হাতির শুধু শুঁড় কিংবা পা দেখা যাচ্ছে। আমরা যে হস্তীশাবক দেখতে এসেছি, তার দেখা পাচ্ছি না। ঘণ্টাখানেক এভাবেই চলল। কোনো উপায় না পেয়ে আমরা পাশের আরেকটি পাহাড়ে এসে বসলাম। আমি আর আমীর সেখানে বসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যদের পাঠিয়ে দিলাম দূরে, যাতে হাতি বিরক্ত না হয়। আমার ধারণা ছিল, হাতি একসময় বেরিয়ে আসবে আর তখনই আমরা ছবি তুলব। কিন্তু ততক্ষণে দুপুর হতে চলেছে। বাড়ছে রোদের তীব্রতা। ফলে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে। হাতি এই রোদের মধ্যে বনের ছায়া থেকে তো মোটেই বের হবে না। এভাবেই ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকলাম। আমাদের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। রাতের বাসে আবার ঢাকায় ফিরতে হবে। পরদিন ক্লাস-পরীক্ষা আছে।

বিজ্ঞানচিন্তা : একজন গবেষক হিসেবে এ ঘটনার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত আবেগ কতটুকু জড়িত?

এম এ আজিজ : এই হাতি দলটির সঙ্গে আমার দুটি বিশেষ আবেগ বা স্মৃতি জড়িত। প্রথমত, হাতি নিয়ে আমি একটি বইয়ের



রাঙামাটির এই হাতির দলেই আছে একটি গোলাপি হস্তীশাবক;
ছবি : এম এ আজিজ

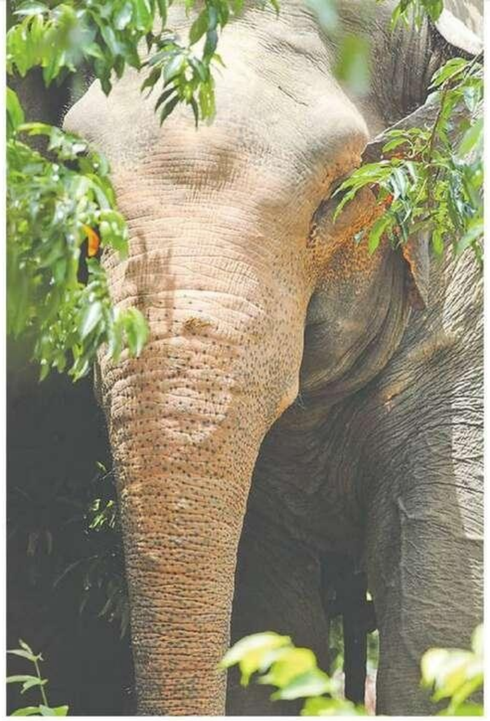
পাণ্ডুলিপি প্রায় শেষ করেছি। বইয়ে সংযোজনের জন্য এশিয়ান সাদা হাতি নিয়ে যখন আমি নানা তথ্য-উপাত্ত পড়ছিলাম, ঠিক তখনই বাংলাদেশে এই সাদা হস্তীশাবকসহ খবরটি নজরে আসে। বিষয়টি বেশ কাকতালীয় মনে হলো আমার কাছে। কারণ, সাদা হাতি নিয়ে প্রধানত থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের তথ্য পাচ্ছিলাম। আর বাংলাদেশে তো সাদা হাতির কোনো অস্তিত্বই নেই। ফলে বেশ শিহরিত হলাম। কারণ, বইয়ে হাতির ছবির জন্য বেশ কিছুদিন ধরে শেরপুরের হাতি পর্যবেক্ষণে যাওয়ার পরিকল্পনা করেও হয়ে উঠছিল না। ফলে এটি একটি চমৎকার সুযোগ হিসেবেও এল আমার কাছে।

দ্বিতীয়ত, রাঙামাটির যে হাতির দলে গোলাপি হস্তীশাবক দেখা গেছে, এই হাতির দলের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের একটি গবেষণার সম্পর্ক আছে। আমি যখন এমএসসি পর্যায়ে ২০০১-০২ সালের দিকে গবেষণার কাজে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় চষে বেড়িয়েছি, সেই সময় এই হাতির দলকে রাঙামাটির রাঙ্গিপাড়া বনাঞ্চলে প্রথম দেখি। পরে ২০১১ সালে এই হাতির দল নিয়ে আবারও কিছু গবেষণার কাজ করি। ওই সময় হাতির দলটি রাঙ্গিপাড়া থেকে বেশ দক্ষিণে ভাসাইন্যাদাম গ্রামে ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। মানুষ ও হাতির সংঘাতে ওই গ্রামের এক প্রবীণ ব্যক্তি নিহত হন। ঘটনার পরদিন আমি ওই গ্রামে উপস্থিত হই। গ্রামে হাতি এলে ফসল ও সম্পদ রক্ষায় ওই মৃত ব্যক্তি সব সময় নেতৃত্ব দিতেন। হাতি যে রাতে তাঁকে আক্রমণ করে, সেদিন শুধু তাঁর বাড়ি তছনছ করে এবং তাঁকে পায়ে পিষে মেরে চলে যায়। গ্রামবাসীর ধারণা, হাতির দল তাঁকে টার্গেট করে হত্যা করেছে। কারণ, হাতি তাঁকে শত্রু মনে করেছে! ২০২৫ সালে এসে এই হাতির দলে একটি বিরল গোলাপি হস্তীশাবক দেখে আজ থেকে ২৫ বছর আগের স্মৃতি মনে পড়ছে। ওই সময় এই হাতির দলের তাড়া খেয়ে পড়িমরি করে রেহাই পেয়েছিলাম। ফলে এই হাতির দলের সঙ্গে আমার জানাশোনা দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে।

বিজ্ঞানচিন্তা : এটি কি আসলেই গোলাপি হাতি, নাকি আলো, ধুলা বা অন্য কোনো কারণে গায়ের রং এমন দেখা গেছে? গোলাপি বা সাদা হাতি কি কোনো বিশেষ প্রজাতি, নাকি এটি সাধারণ এশীয় হাতির মধ্যে বিরল রংজনিত ভিন্নতা?

এম এ আজিজ : হস্তীশাবকটি যদি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখা যাবে, গোলাপি শাবকটির প্রায় সমবয়সী আরও একটি শাবক আছে। ওই শাবকের গায়ের রং কিন্তু কালো। সেই সঙ্গে গোলাপি রঙের শাবকটির মায়ের গায়ের রংও কালো। গোলাপি রঙের শাবকটির গায়ের রং কালো, হাতির মতো কালো নয়। চোখের রংও ব্যতিক্রম। হস্তীশাবকের রোম সাধারণত কালো হয়। ফলে শাবকের গায়ের রং মা-

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD



কোভিডের পর থেকে বাংলাদেশের হাতি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে; *ছবি : এম এ আজিজ*

খালার রঙের চেয়ে আরও বেশি কালো দেখায়, অর্থাৎ এ শাবক বিশেষ এই গোলাপি রং জন্মগতভাবে পেয়েছে।

শাবকটির এমন রং দেখে অনেকের কাছে এটি ভিন্ন প্রজাতি বলে মনে হতে পারে। আসলে এই গোলাপি হাতি বিশেষ কোনো প্রজাতির হাতি নয়, এটি এশিয়ান হাতির মধ্যে রংজনিত ভিন্নতামাত্র। হাতির এমন রং অত্যন্ত বিরল ঘটনা। প্রায় ১০ হাজার শাবকের মধ্যে একটি এমন রঙের ভিন্নতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, হাতির এই গোলাপি রং কতটা বিরল।

প্রাণিদেহের রং নির্ধারিত হয় মেলানিন নামের একটি বিশেষ ধরনের রঞ্জক দিয়ে। বিশেষ করে এই মেলানিনের মাধ্যমে প্রাণীর ত্বক, রোম ও চোখের রং নির্ধারিত হয়। আবার মেলানিন তৈরি ও নিয়ন্ত্রিত হয় জিনগত প্রচ্ছন্ন (Recessive trait) ফ্যাক্টরের সাহায্যে। পিতা ও মাতা উভয়ের থেকে বাচ্চার শরীরে যখন মেলানিন তৈরির প্রচ্ছন্ন জিন বা ফ্যাক্টর স্থানান্তরিত হয়, তখন বাচ্চার গায়ে মেলানিন তৈরি হতে পারে না। আবার অনেক সময় মেলানিন তৈরির জিনে মিউটেশন ঘটলেও এমনটি হতে পারে। ফলে বাচ্চার ত্বক, রোম ও চোখের রং সাদা, গোলাপি বা বাদামি হতে পারে। প্রাণীর শরীরের এসব অংশে স্বাভাবিক রং দেখা না গেলে এমন প্রাণীকে বিজ্ঞানীরা অ্যালবিনো হিসেবে অভিহিত করেন।

বিজ্ঞানচিন্তা : এই হাতির গায়ের রং কি তার স্বাস্থ্য বা পরিবেশগত কোনো সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে?

এম এ আজিজ : প্রাণীর এমন রং দেখা দেয় মূলত জিনগত কারণে। মেলানিন তৈরির জন্য দায়ী জিনের মিউটেশন ঘটলে পরের প্রজন্মের মধ্যে তা প্রবাহিত হতে পারে। আবার কোনো কারণে মেলানিন তৈরির জিন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বন্ধ হয়ে যেতে পারে মেলানিন সৃষ্টি। তখনো এমন রঙের প্রাণীর দেখা মেলে।

আবার প্রাণীর কোনো পপুলেশনে যখন সদস্যসংখ্যা খুব কমে যায় অথবা আবাসস্থলের ধ্বংস বা সংকোচন ঘটলে প্রাণীর বড় দল খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। তখন কাছাকাছি সম্পর্কের সদস্যদের মধ্যে প্রজনন ঘটে। এতেও প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের শাবকের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অ্যালবিনো প্রাণীরা বুনো পরিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। দলের মধ্যে থেকেও সে নিজেকে আলাদা ভাবতে থাকে। মানুষের মতো তারাও সহজে অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারে না। তা ছাড়া দূর থেকে সহজে তারা মানুষ কিংবা প্রাকৃতিক শিকারের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে নানা বিপদ আসে। শিকারিরাও এই ব্যতিক্রমী প্রাণীকে সহজে নিশানা করতে পারেন।

যেহেতু মেলানিন চোখ ও ত্বকের সুরক্ষা দেয়, তাই অ্যালবিনো প্রাণীরা সূর্যের ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারে না। এসব প্রাণী সহজে সানবার্নের (রোদে পোড়া) শিকার হয়। এতে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া চোখে দেখতেও সমস্যা হয়।

বিজ্ঞানচিন্তা : এই হাতি কি বর্তমানে ঝুঁকিতে আছে বলে মনে করছেন? কী ধরনের হুমকি এর জন্য সবচেয়ে বেশি?

এম এ আজিজ : পুরো হাতির দলটিই ঝুঁকির মধ্যে আছে। বর্ষাকাল চলছে। ফলে কাপ্তাই লেকে পানি বাড়ছে। এতে হাতির বিচরণ এলাকা মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। পুরো এলাকায় নানা ধরনের ফলের বাগান গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগই ব্যক্তিমালিকানা জমি। কোনো বুনো পরিবেশ নেই। সরকারের কিছু বনভূমি ছড়িয়ে আছে বরকল উপজেলায়। ফলে হাতির খাদ্যের সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি মানুষের সঙ্গে সংঘাত লেগেই আছে।

দ্বিতীয়ত, এই হস্তীশাবক দেখতে নানা শ্রেণির মানুষ ভিড় করতে পারেন। স্থানীয় মানুষও উৎসাহী হয়ে উঠবেন। ফলে হাতির দল বিরক্ত হবে। এমনকি মারমুখী হয়ে উঠতে পারে। এতে মানুষের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হবে, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

বিজ্ঞানচিন্তা : এই প্রজাতিকে সুরক্ষার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? স্থানীয় বন বিভাগ বা প্রশাসনের কাছে আপনি কী ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেন?

এম এ আজিজ : বরকল এলাকাটি বেশ দুর্গম। ফলে বন বিভাগ এই হাতির নিয়মিত মনিটরিং করতে হিমশিম খায়। ওই এলাকায় বন বিভাগ তিনটি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম তৈরি করেছে। তাদের সক্রিয় রাখা খুব জরুরি। আর এই কাজে বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রণোদনা দেওয়ার তেমন কোনো বরাদ্দ নেই। তেমন কোনো ভালো যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই বন বিভাগের নিজেদেরও। তাদের অর্থের সংকট আছে বলেও জেনেছি।

এলাকাটি মূলত ব্যক্তিমালিকানাধীন হওয়ায় হাতি নিয়মিত ফসল ও পরিসম্পদের ক্ষতি করছে। তাঁদের ক্ষতিপূরণ বন বিভাগ নিয়মিতভাবে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দুর্গম এলাকা হওয়ায় স্থানীয় মানুষেরা সঠিক সময়ে ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেন না। ক্ষতিপূরণের আবেদনপ্রক্রিয়া সহজ করা যায় কি না, ভেবে দেখতে হবে।

হাতির দলকে নিয়মিত মনিটরিংয়ে রাখতে হবে। খাবারের সংকট মেটাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ বাড়াতে নিয়মিত মিটিং ও আলোচনা অব্যাহত রাখা জরুরি।

বিজ্ঞানচিন্তা : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাতিটিকে নিয়ে মানুষের আগ্রহ চোখে পড়ছে। এই আগ্রহ কি বন্য প্রাণী সুরক্ষার পক্ষে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

এম এ আজিজ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খুব দ্রুত সমাজের নানা প্রান্তের সব খবর পৌঁছে যায়। এই হাতির ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। ফলে এমন হাতি নিয়ে মানুষের জানার কৌতূহল সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এতে হাতির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া আসবে বলে বিশ্বাস করি। সরকারের ওপরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সমর্থন প্রয়োজন হবে। কারণ, রাঙামাটির মতো দুর্গম এলাকায় চলাচল ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নানা বাধা পেরিয়ে তবেই প্রান্তিক পর্যায়ের বনকর্মীরা কাজ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় যানবাহন ও জনবলের অভাব মেটাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি নেতিবাচক দিকও আছে। নানা মাধ্যমে প্রচারের ফলে ওই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের দর্শনার্থী, আলোকচিত্রী ও মিডিয়ার কর্মীরা ভিড় করতে পারেন। তাতে হাতির দল বিরক্ত ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এমন ঘটনা নিয়মিত ঘটলে তাদের দৈনন্দিন খাবার গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এতে হাতির দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিজ্ঞানচিন্তা : এ ঘটনা ঘিরে নতুন কোনো গবেষণার পরিকল্পনা আছে কি? বাংলাদেশের বন্য হাতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আপনি কীভাবে দেখছেন?

এম এ আজিজ : আমাদের দেশে বন্য প্রাণী নিয়ে গবেষণার অপার সম্ভাবনা আছে। তবে পরিতাপের বিষয়, এ দেশে সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কোনো জোগান নেই বললেই চলে। যেমন আমার বড় কয়েকটি গবেষণা, বিশেষ করে বাঘের জিনগত গবেষণা ও বাঘের শিকার প্রাণীর জরিপ, নদীর শুশুকের পপুলেশন ও মেছো বিড়ালের ওপর পরিচালিত গবেষণার সব অর্থই দেশের বাইরের বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছে প্রতিযোগিতা করে পেয়েছি। এসব গবেষণার জন্য দেশে আর্থিক সুবিধা পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। তা ছাড়া ঘাটপাট চুকিয়ে তবেই মিলতে পারে গবেষণার অর্থ।

দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক গবেষক থাকলেও ভালো মানের গবেষকের ঘাটতি আছে। সরকারি বা কোনো দাতা সংস্থা থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেলে এই হাতি মনিটরিং ও স্থানীয় মানুষের সমর্থন আদায়ে কাজ করার সুযোগ আছে। বিশেষ করে গোলাপি হাতির বেড়ে ওঠায় কী ধরনের পরিবর্তন কিংবা বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়ছে, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা জরুরি।

কোভিডের পর থেকে বাংলাদেশের হাতি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একদিকে নিয়মিত বিরতিতে হাতি মারা পড়ছে, অন্যদিকে হাতির আক্রমণে প্রান্তিক কৃষকেরা মারা যাচ্ছেন। হাতির জন্য টিকে আছে অতীত বনের কঙ্কাল। ভেতরে গাছ নেই, খাবার নেই, পানি নেই। মানুষের থাবায় হাতির আবাস যেমন সংকুচিত হয়েছে, তেমনি ক্ষয় হয়েছে অতিমাত্রায়। ফলে হাতিরা মানুষের ফসলের খেতে, বাড়ির গোলায় রাখা ধান ও চালে হানা দিচ্ছে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের হাতির আবাস ক্ষত-বিক্ষত। নানা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক, রেললাইন স্থাপন, রোহিঙ্গা বসতি স্থাপন ইত্যাদি নানা কারণে হাতিরা আজ দিশাহারা। শেরপুরে ভারতের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে সেখানকার হাতির চলাচলের রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশ অংশে আটকা পড়েছে শতাধিক হাতির দুটি দল। অথচ বাংলাদেশ অংশে নেই তেমন কোনো বনাঞ্চল ও বনভূমি। ফলে প্রতিনিয়ত চলছে হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত।

হাতি ও হাতির বাড়িঘরের এই যখন অবস্থা, তখন আমি একজন আশাবাদী মানুষ হয়েও প্রায়ই নিরাশ হয়ে পড়ি। স্থলভাগের এই বৃহত্তম প্রাণী কি আদৌ বাংলাদেশে টিকে থাকবে? আমাদের অক্ষমতাই কি জয়ী হবে? বিরল গোলাপি হাতির দল রক্ষায় আমাদের অক্ষমতা যেন জয়ী না হয়।



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বইপত্র

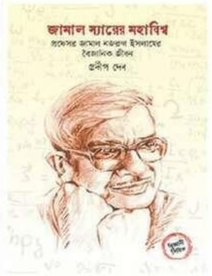
অধ্যাপক জামাল নজরুল ও তাঁর বিজ্ঞানী-জীবন

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

বরেণ্য অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের (১৯৩৯-২০১৩) জীবনী নিয়ে আগে শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকীর *বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম* (অনুপম প্রকাশনী, ২০২৪) বইটি পাঠকের নজর কেড়েছে। তবে ২০২৫ সালে প্রকাশিত প্রথমা প্রকাশনের *জামাল স্যারের মহাবিশ্ব* বইটি অধ্যাপক জামাল নজরুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে, এ কথা বলা যায়। প্রথিতযশা ও অতিপ্রজ বিজ্ঞান লেখক প্রদীপ দেব অধ্যাপক জামাল নজরুলের একটি 'বৈজ্ঞানিক জীবনী' রচনা করতে পেরে কৃতজ্ঞ হয়েছেন এ কারণে যে স্নাতকোত্তর গবেষণার সময়ে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংলাপে অংশ নিতে পেরেছিলেন, যা লেখকের জীবনে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিঃসন্দেহে।

বর্তমান বইটিতে লেখক অনেক পরিশ্রম করে অধ্যাপক জামাল নজরুলের সব বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার ঠিকুজি সংগ্রহ করেছেন, প্রতিটি পেপারের বিষয়বস্তু অথবা সারসংক্ষেপ পেশ করেছেন, সহলেখকদের সংক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ড ও তাঁদের সঙ্গে অধ্যাপক জামাল নজরুলের সম্ভাব্য মিথস্ক্রিয়ার ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে আমরা অধ্যাপক জামাল নজরুলের প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে, আন্তর্জাতিক গবেষকদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধে ও বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর বিচরণ সম্বন্ধে বিশদ জানতে পারি।

বিলেতের কেমব্রিজে পড়াশোনা শেষে বিলেত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক জামাল নজরুলের



জামাল স্যারের মহাবিশ্ব
প্রদীপ দেব

প্রকাশক : প্রথমা
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল
পৃষ্ঠা : ১৪৩
দাম : ৩৮০ টাকা

আনাগোনা ছিল। তিনি বহু বিখ্যাত গবেষকের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু কোথাও থিতু হননি। সিটি ইউনিভার্সিটিতে রিডারশিপ ত্যাগ করে তিনি ফিরে আসেন চট্টগ্রামে। এখানেই শেষতক থিতু হন, বাংলার দামাল ছেলে জামাল!

কেন তিনি বাংলাতেই থিতু হলেন, চট্টগ্রামের নির্জন সার্শন পাহাড়ের 'সাবজা যার' তাঁর নিভৃতের উপাসনালয় হয়ে উঠল, এ প্রসঙ্গ এই বইয়ে তেমন কিছু নেই। এই রহস্য অধ্যাপক জামাল নজরুলের পরিবারের পক্ষ থেকেও খোলাসা করা হয়নি। এই বইয়ে আমরা দেখি, অধ্যাপক জামাল নজরুলের প্রায় সব সহলেখক বা বন্ধু বিভিন্ন দিকপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে থিতু হচ্ছেন, অথচ তিনি অতলান্তিকের দুই ধারে তখনো অনিকেত উন্মূলিত পোস্টডক্টরাল হিসেবে এপার-ওপার করছেন। এর ব্যাখ্যায় অধ্যাপক আরশাদ মোমেন বলেছিলেন, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যেহেতু ফ্রেড হয়েল ও 'স্টেডি-স্টেট থিওরি'র তখন পতিতদশা, সেহেতু হয়েলের কোর গ্রুপের সদস্যরাও ক্রমেই ব্রাত্য হয়ে উঠছেন। সদ্য প্রয়াত জয়ন্ত নারলিকার ভারতে ফিরে এসে 'আয়োকা' গঠন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক জামাল নজরুলও ফিরে এলেন।

অধ্যাপক জামাল নজরুলের মূল আগ্রহের বিষয় ছিল গণিত, তার প্রায়োগিক দিক, বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজিতে তার প্রয়োগ। ফলিত গণিতের নানা বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। বিশেষ করে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের নানা বিষয়সহ গণিতের প্রয়োগ নিয়ে, নানা সমাধান-প্রণালি নিয়ে, প্রোটনের স্থায়িত্ব নিয়ে, অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন।

জামাল নজরুল ইসলাম একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। একটি বাদে সব কটিই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটির নাম *দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স*। বইটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে একাধিক। আলোচ্য বইটির অধ্যায় ৯ এই গ্রন্থের নানা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে।

অধ্যাপক জামাল নজরুলের সবচেয়ে উপযোগী গ্রন্থ হলো *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি*, যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রদীপ দেব জানিয়েছেন, 'পৃথিবীর সব সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য এই বই প্রধান বইয়ে পরিণত হয়েছে।' এ কথা কতটুকু সত্য, তা আমি জানি না, তবে বইটি খুললেই 'চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির' নামটি যখন জ্বলজ্বল করে ওঠে একটি আন্তর্জাতিক মানের বইয়ের লেখকের পরিচিতিতে, তখন সেটা বাঙালি হিসেবে আত্মশ্লাঘার বিষয় তো বটেই।

এই বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলো অধ্যায় ছয়। মুক্তিসংগ্রামে অধ্যাপক জামাল নজরুলের ভূমিকা, তাঁর বিরল কিছু চিঠিপত্র, যা তিনি রাষ্ট্রনায়কদের লিখেছিলেন, এসব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এটি।

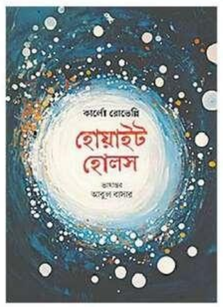
অধ্যাপক জামাল নজরুলের মূল খ্যাতি আসে ম্যান্ডেলস্টাম রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে তাঁর করা গাণিতিক গবেষণা এবং কসমোলজির বিভিন্ন গাণিতিক সম্ভাবনা, সূত্র নির্ধারণ, আইনস্টাইনের সমীকরণের বিবিধ বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সমাধান ইত্যাদি থেকে। এসব কাজের ধারাবাহিক ফল হলো গাণিতিক কসমোলজি নিয়ে তাঁর বইটি। তিনি আরেকটি কারণেও বিখ্যাত—মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে তাঁর নিবেদিত গাণিতিক গবেষণা ও এ-সংক্রান্ত তাঁর সুবিখ্যাত জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থ *আলটিমেট ফেইট*। অবশ্য মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে বিশেষ কাজ করেছেন ফ্রিম্যান ডাইসনসহ আরও অনেকে। কিন্তু আশির দশকে এ বিষয়ে অধ্যাপক জামাল নজরুলের বইটি ছিল সবচেয়ে প্রামাণ্য এবং একই সঙ্গে পাঠযোগ্য।

প্রদীপ দেবের বইটি অধ্যাপক জামাল নজরুলের জীবন নিয়ে, তাঁর ধারাবাহিক বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে, তাঁর প্রকাশনার তালিকা (৭টি গ্রন্থ, ৫৯টি পেপার), বৈদেশিক জীবন, পরিবার পরিচিতি ইত্যাদি এতে উঠে এসেছে। লেখক অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন এবং আমাদের প্রভূত উপকার করেছেন অধ্যাপক জামাল নজরুলের জীবন তুলে ধরতে। লেখকের মতে, অধ্যাপক জামাল নজরুলের দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—উদাসীনতা ও জেদ তাঁকে কিছুটা নিঃসঙ্গ করে রেখেছিল। আমি লেখকের সঙ্গে একমত, তিনি যখন ঢাকায় বক্তব্য দিতে আসতেন, প্রায় সব কটিতেই আমি অংশ নেওয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু অধ্যাপক জামাল নজরুলকে আমরা নিভৃতে কখনো পাইনি। প্রয়াত অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ বলেছিলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, প্রফেসর জামাল আর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শক্তিশালী কসমোলজি গ্রুপ করব, সেটা হলো না, তিনি চট্টগ্রামেই থেকে গেলেন। অধ্যাপক জামাল নজরুল উদাসীন না হলে কসমোলজির আরও কিছু বই বাংলায় ও ইংরেজিতে আমরা পেতাম।'

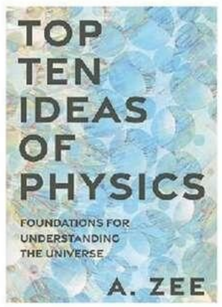
আমরা প্রত্যাশা করি, প্রদীপ দেবের হাত ধরে নতুন কোনো গবেষক অধ্যাপক জামাল নজরুলের পূর্ণাঙ্গ মানবিক পরিচয় ফুটিয়ে তুলবেন। আলোচ্য বইটির নামকরণ নিয়ে আমার কিছুটা দ্বিধা আছে যদিও। একজন বিজ্ঞানীকে তাঁর পেপার দিয়ে, কাজ দিয়ে চিনতে হয়। তবু মানুষ হিসেবে তিনি কেমন, সেটাও জানা দরকার। তাঁর প্রস্তুতি পর্ব, তাঁর প্রিয় বই ও ব্যক্তিত্ব—এগুলোও জানা দরকার। দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক জামাল নজরুলের বাংলা বই *কৃষ্ণ বিবর* বাংলা একাডেমি থেকে রিপ্রিন্ট হলেও তাঁর অন্য বাংলা বই দুটি আর পাওয়া যায় না। অধ্যাপক জামাল নজরুলের সামগ্রিক লেখালেখি নিয়ে একটি রচনাবলি থাকা প্রয়োজন।

লেখক : অধ্যাপক, তড়িৎকৌশল ও ইলেকট্রনিক বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

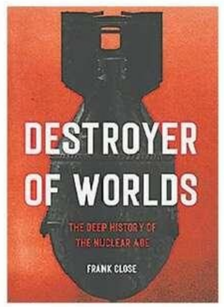
নতুন বই



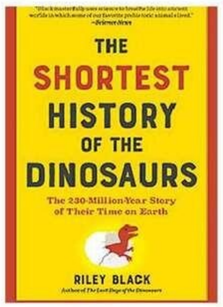
হোয়াইট হোলস
কার্লো রোভেল্লি
অনুবাদ : আবুল বাসার
প্রকাশক : প্রথমা
পৃষ্ঠা : ১৬০
দাম : ৩২০ টাকা
ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের কথা আমরা সবাই জানি। এর কেন্দ্রে, ভবিষ্যতে আছে অদ্ভুত শ্বেতগহ্বর, হোয়াইট হোল। সেই রোমাঞ্চকর কাহিনি...



টপ টেন আইডিয়াজ অব ফিজিকস
এ জি
প্রকাশক : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস
পৃষ্ঠা : ৩৫২
দাম : ৩০.২ ডলার
পদার্থবিদ্যার মৌলিক ১০টি আইডিয়া, আপেক্ষিকতা থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, মৌলিক বলসহ আরও অনেক কিছু...



ডেস্ট্রয়ার অব ওয়ার্ল্ডস
ফ্র্যাঙ্ক ক্লোজ
প্রকাশক : বেসিক বুকস
পৃষ্ঠা : ৩৫২
দাম : ২৯.৭ ডলার
হেনরি বেকরেল ও মেরি কুরি থেকে তেজস্ক্রিয়তার সূচনা, আইনস্টাইন, ওপেনহাইমারের মতো বিজ্ঞানীদের হাত ধরে গড়ে ওঠা পরমাণুবোমা ও পৃথিবীর ধ্বংসদূত...

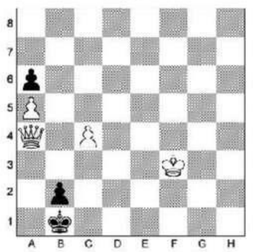


দ্য শর্টেস্ট হিস্ট্রি অব দ্য ডাইনোসরস
রাইলি ব্ল্যাক
প্রকাশক : দ্য এক্সপেরিমেন্ট
পৃষ্ঠা : ২৪০
দাম : ১৬.৯ ডলার
সহজ ভাষায়, মজার গল্পে ডাইনোসরের ২৩০ মিলিয়ন বছরের ইতিহাস, তাদের বিলুপ্তির পেছনের কারণ এবং প্রাচীন পৃথিবীর কথা...

দুই চালে মাত ১০৩

এখানে দুটি দাবার ধাঁধা দেওয়া আছে। ধাঁধাগুলো দুই চালে মাত করতে হবে। সঠিক সমাধানদাতা তিনজনের জন্য রকমারি ডটকমের সৌজন্যে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই। খামের ওপর অবশ্যই 'দুই চালে মাত ১০৩' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

ধাঁধা ১

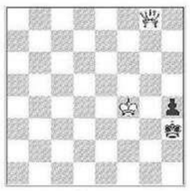


ধাঁধা ২



দুই চালে মাত ১০২-এর উত্তর

ধাঁধা ১ 1. l.Ke3 Kfl 2. Qf2#
ধাঁধা ২ l...Ke6 2.Kf8 Qd8#



ধাঁধা ১



ধাঁধা ২

দুই চালে মাত ১০২-এর বিজয়ী

শাহরিয়ার আলম, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
মাহিনুর রহমান, পাথরঘাটা, বরগুনা
রায়হান চৌধুরী, মান্দা, নওগাঁ

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



পদার্থবিদ্যা

কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্ট

আবদুল গাফফার

এক সময় মনে করা হতো, দর্শনের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের বড্ড আড়ি। বিশেষ করে দর্শনের অতি ভাববাদী কিংবা জটিল প্যারাডক্সগুলোকে পদার্থবিজ্ঞান সমর্থন করত না। অস্পষ্টতা, অপরিমাপযোগ্য ব্যাপারস্যাপার পদার্থবিজ্ঞানে চলত না বললেই চলে। বিশেষ করে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে। এখানে 'মাপজোখ' ব্যাপারটা বড্ড নিখুঁত। তাই হিসাব-নিকাশ করে যেকোনো পদার্থ বৈজ্ঞানিক সিস্টেমের ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল। ছিল বলি কেন, চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে সেটা এখনো সম্ভব।

কিন্তু গত শতাব্দীর বিশের দশকে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা একের পর এক হাজির করে অনিশ্চয়তায় ভরা তত্ত্ব। সেসব তত্ত্ব আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে যেমন বিভ্রান্ত করে, তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও ফেলে বড় প্রভাব; অর্থাৎ এ তত্ত্বগুলো ল্যাবরেটরিতেও অদ্ভুত ও অনিশ্চিত ফলাফল দিতে শুরু করে। তখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খোদ আইনস্টাইনই এর বিরুদ্ধে সরব হন। দুটি পক্ষ দাঁড়িয়ে যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পক্ষে-বিপক্ষে। তৈরি হয় একের পর এক প্যারাডক্স বা বিভ্রম। সেসব বিভ্রমের ব্যাখ্যাও আসতে শুরু করে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পক্ষের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অদ্ভুত আইনগুলোর পরীক্ষামূলক প্রমাণ যখন আসতে শুরু করে, তখন প্রয়োজন হয় দার্শনিক ব্যাখ্যার। সেসব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নতুন নতুন বিভ্রমের জন্ম হয়, সেগুলোরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। এভাবে গোটা এক শতাব্দী ধরে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বিভ্রমের পালক। ফলে নতুন নতুন ব্যাখ্যারও প্রয়োজন পড়ছে। তেমনই একটি বিভ্রম হলো কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্ট।

২.

কী এই জেনো ইফেক্ট? বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক জেনো ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই প্যারাডক্সের বরপুত্র। তাঁর বেশ কিছু প্যারাডক্স ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। এর মধ্যে অ্যাকিলিস ও কচ্ছপের গল্পটা তো পরিণত হয়েছে ক্ল্যাসিক প্যারাডক্সে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত প্যারাডক্স হলো গতিশীল তিরের থেমে যাওয়া।

ধরা যাক, একটা তির ছুড়ছেন আপনি। কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিরটি কোনো একটা বিন্দুতে অবস্থান করে। ওই বিন্দুতে তিরের বেগ শূন্য। শুধু তির নয়, যেকোনো গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রেই এ বিভ্রম তৈরি হয়। তির হোক কিংবা দুরন্ত বেগে চলে একটা গাড়ি—কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অবস্থানে তার গতি শূন্য। একটা বড় 'সময়' তৈরি হয় অজস্র মুহূর্তের সমন্বয়ে। তেমনই একটা বড় দূরত্ব তৈরি হয় অজস্র বিন্দুর যোগফলে। স্থান ও কালের প্রতিটা বিন্দুতে যার গতি শূন্য, একটা বড় সময় পর দেখা যায়, সেই বস্তুই বেশ খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এই যে বৈপরীত্য, এর কারণেই তৈরি হয় প্যারাডক্স।

এ প্যারাডক্সের সমাধান লুকিয়ে আছে নিউটনের গতিসূত্রে, যা নিউটন করেছিলেন ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস ব্যবহার করে। যেখানে সময় ও স্থানকে অতিক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা যায়। এরকম প্রতিটি অতিক্ষুদ্র ভাগে গতিশীল বস্তুর তাৎক্ষণিক বেগ থাকে, যা অশূন্য। নিউটনীয় গতিবিদ্যায় জেনোর এই প্যারাডক্সের সমাধান তো মেলে, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায়?

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় জেনোর এই প্যারাডক্স প্রয়োগের কথা প্রথম ভাবেন আধুনিক কম্পিউটারের অন্যতম পুরোধা অ্যালান টুরিং ও কোয়ান্টাতত্ত্ববিদ জন ভন নিউম্যান। ১৯৫০-এর দশকে। তাঁদের সেই ধারণা অবশ্য অতটা পোক্ত ছিল। তবে ১৯৭৭ সালে ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী বৈদ্যনাথ মিশ্র ও মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জর্জ সুদর্শন সফল হন। তাঁরা আটকে রাখা আয়ন, সুপারকন্ডাক্টিং কোয়ান্টাম বিট বা কোয়ান্টাম ক্যাভিটিতে আটকে রাখা পরমাণুসহ বহু কোয়ান্টাম সিস্টেমে এ ইফেক্ট প্রয়োগ করেন এবং সফল হন।

এখন মূল প্রশ্ন হলো, কী এই কোয়ান্টাম জেনো প্যারাডক্স?

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বলে, জগতে কোনো বস্তুর গতি বা অবস্থান, এমনকি কণাদের চরিত্রও সুনির্দিষ্ট নয়। এর একটি ধর্ম পর্যবেক্ষণ করতে গেলে আরেকটি ধর্ম অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর কণাদের এই অদ্ভুত চরিত্র ও ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয় হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব ও শ্রোডিঙ্গারের ওয়েভ ফাংশনের মাধ্যমে। এ দুটি তত্ত্ব আসলে একই—দুই বিজ্ঞানী আলাদা আলাদাভাবে এটা আবিষ্কার করেছিলেন, এই যা।

অনিশ্চয়তা বা তরঙ্গ ফাংশনের তত্ত্ব অনুযায়ী, আপনি যখন কোনো বস্তুর কোনো একটা ধর্ম পর্যবেক্ষণ করবেন, তখন এর তরঙ্গ ফাংশন কলাপস করবে বা ভেঙে পড়বে। তখন বাকি সব ধর্ম অনিশ্চিত হয়ে যাবে। শুধু যে ধর্মটা আপনি পর্যবেক্ষণ করবেন, সেটাই কাজ করবে ঠিকঠাক। কথাটার মানে হলো, পরিমাপের আগে কণাটি সম্ভাব্য একাধিক অবস্থায় থাকলেও পরিমাপের ঠিক ওই মুহূর্ত কণাটি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রকাশ করবে। আপনি যে ধর্মটা পর্যবেক্ষণ করবেন, সেটাই হবে সুনির্দিষ্ট; অন্য ধর্মগুলো হয়ে পড়বে আরও অনিশ্চিত। ঠিক এ জায়গাতেই কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা জেনোর আড়াই হাজার বছরের পুরোনো প্যারাডক্সটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

সেটা কীভাবে? ধরা যাক, কোনো একটা কণা গতিশীল। আপনি সেই কণার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে চান; অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিন্দুতে কণাটিকে আপনি দেখতে চান। সেভাবেই যন্ত্রপাতি সাজালেন। যখন আপনি কণাটির অবস্থান জানার জন্য পরীক্ষা চালালেন, তখন কণাটির তরঙ্গ ফাংশন কলাপস করবে; অর্থাৎ অবস্থান ছাড়া বাকি সব ধর্ম অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এর অর্থ, একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কণাটিকে 'স্থির অবস্থায়' দেখতে পাবেন। বলা প্রয়োজন, 'স্থির অবস্থায়' মানে কণাটি গতি হারিয়ে থেমে যাবে না, বরং ওই মুহূর্তে তার একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান আপনি নির্ণয় করতে পারবেন। এটুকু হয়তো সমস্যা না; কিন্তু যদি আপনি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান, তাহলে কী হবে?

এখানেই জেনোর সেই প্যারাডক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মতে, কোনো কণার একটা চরিত্র যদি আপনি দেখতে চান, সেই চরিত্রই দেখতে পাবেন, কিন্তু অন্য চরিত্রগুলো অনিশ্চিত হয়ে পড়বে; অর্থাৎ যখন কণাটাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিন্দুতে দেখতে চান, কণাটা সেই বিন্দুতেই স্থির অবস্থায় দেখতে পাবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়টাকে যদি আরেকটু বাড়িয়ে নেন; অর্থাৎ প্রথম মুহূর্তে আপনি স্থির দেখলেন, কিন্তু চোখ সরালেন না। তাহলে দ্বিতীয় মুহূর্তেও কী কণাটাকে সেখানে স্থির দেখবেন? কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মানুযায়ী সেটাই হওয়ার কথা; অর্থাৎ আপনি যতক্ষণ না চোখ সরাচ্ছেন, কণাটা সেখানে স্থির হয়ে থাকছে। অথচ আপনি একটা গতিশীল কণা পর্যবেক্ষণ করছেন। কথাটা বিজ্ঞানের ভাষায় এভাবে বলা হয়, 'আপনি যদি বারবার বা ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে কণাটা সেই চরিত্রটাই ধরে রাখার চেষ্টা করে, অন্য কোনো চরিত্রে পরিবর্তিত হতে অনীহা দেখায়!' অর্থাৎ কণাটা অন্য কোনো অবস্থায় পরিবর্তিত হলে চাইলেও আপনার পর্যবেক্ষণ সেই প্রক্রিয়াকে ধীরে করে দিতে, এমনকি সাময়িকভাবে থামিয়েও দিতে পারে। সরল বাংলায় বললে, নিউটনীয় গতিবিদ্যায় কণাটার স্থির হয়ে থাকার উপায় নেই, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সেটা সম্ভব। তাই তো কোয়ান্টাম মেকানিকসের জগৎটা এত অদ্ভুত!

৩.

কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্ট বোঝার জন্য আরেকটু সহজ উদাহরণ দিই। ধরুন, আপনি ঘুমাচ্ছেন, একটা ফোন এল। ফোনে কথা সেরে যেই ঘুমাতে যাবেন, আবার মোবাইলে টুংটাং আওয়াজ। এবার কেউ মেসেঞ্জারে নক করেছেন। সেটা সেরে আবার যেই ঘুমাতে যাচ্ছেন, তখনই হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে আরেকজন নক করলেন। এভাবে আপনার ঘুমাতে যাওয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আপনি যদি কোয়ান্টাম কণা হন, ঘুম যদি হয় আপনার একটা আচরণ; তাহলে ফোন, ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে নককারী বন্ধুরা হবেন পর্যবেক্ষক। এসব পর্যবেক্ষক বারবার পর্যবেক্ষণ করে আপনার ঘুমের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করছেন। এটাই আসলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় জেনো ইফেক্ট নামে পরিচিত।

আরেকটা উদহারণ দিই। ধরুন, আপনি কয়েন দিয়ে টস করছেন। টস করার আগে হেড ও টেল পড়ার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি। কয়েন যখন ওপর থেকে মাটিতে পড়ছে, বারবার আপনি সেটা ধরে থামিয়ে কোনো এক মুহূর্তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। এভাবে বারবার থামানোর ফলে হেড ও টেল পড়ার যে প্রক্রিয়া, সেটাকেই বিঘ্নিত করছেন আপনি। জেনো ইফেক্ট অনেকটা এমন।

জেনো ইফেক্ট নিছকই একটা প্যারাডক্স বা তত্ত্ব নয়। রীতিমতো পরীক্ষাগারে প্রমাণিত একটা ব্যাপার। আসলে শুরু থেকেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মাপজোখের ব্যাপারে একেবারে গোলমেলে; অর্থাৎ মেজারমেন্টের সমস্যা এখানে চিরকালই ছিল। জেনো ইফেক্ট সেটারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। আপনি যখন কোনো কোয়ান্টাম কণার মাপজোখ করতে যাচ্ছেন, তখন সেই সিস্টেমের আচরণ বদলে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জার্মানির আলেকজান্ডার ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ ড্যানিয়েল বুরগার্থ বলেন, কোয়ান্টাম মেকানিকসে মেজারমেন্ট বা মাপজোখের অর্থ শুধু সেখান থেকে তথ্য নেওয়া নয়; বরং সেই মাপজোখ পুরো সিস্টেমের ওপর একটা প্রভাব ফেলে।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জিওভানি ব্যারোত্তিনি জেনো ইফেক্ট পরীক্ষা করেছেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটা অনেকটা পাত্রে পানি ফোটানোর মতো। চিরায়ত বলবিদ্যায় কোনো পাত্রে পানি রেখে সেটা চুলায় চাপালেই হয়। সেটা আপনি পর্যবেক্ষণ করেন বা না করেন, সেটা ফুটতেই থাকবে; কিন্তু এ ধরনের ঘটনা কোয়ান্টাম-জগতে ঘটবে না। আপনি পর্যবেক্ষণ না করা পর্যন্ত পাত্রের পানি ফুটতে শুরু করবে না; কিন্তু জেনো ইফেক্ট এ পর্যবেক্ষণকেই প্রভাবক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ব্যারোত্তিনি বলেন, 'কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্টের মতো ঘটনা চিরায়ত বলবিদ্যায় ঘটা অসম্ভব; কিন্তু কোয়ান্টাম-জগতে এটা হামেশা ঘটে। এখানে পাত্রের পানিগুলো তখনই ফুটবে, যখন আপনি সেটা পর্যবেক্ষণ করবেন। ওরা যেন বোঝে, ওদের কেউ দেখছে।'

৪.

আইনস্টাইন সেকালে কোয়ান্টামের অদ্ভুত আইনগুলো মানতে পারেননি। তাই একের পর এক নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তবে এ যুগের বিজ্ঞানীদের কেউ আইনস্টাইনের পথে হাঁটছেন না। কোয়ান্টামের অদ্ভুত নীতিগুলো মেনে নিয়েই এগোচ্ছেন তাঁরা। মাপজোখের এ বিভ্রান্তি মেনে নিয়ে সেটাকে বরং উন্নত প্রযুক্তিতে কাজে লাগাচ্ছেন হাতিয়ার হিসেবে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কথাই ধরা যাক। সাধারণ কম্পিউটারের মূল ভিত্তি বিট—এর মান ১ ও ০-এর ওপর ভিত্তি করে এগোয় কম্পিউটারের সব কাজ। এখানে ১ মানে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালু আর ০ মানে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ। সাধারণত ট্রানজিস্টর নামের ক্ষুদ্র একধরনের সুইচের মাধ্যমে কম্পিউটারে বিটগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। কিউবিটের কার্যকারণ সাধারণ বিটের ঠিক উল্টো। বিট কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ০ ও ১-এর যেকোনো একটি দশায় থাকতে পারে; কিন্তু কিউবিট একই সঙ্গে একাধিক দশার সুপারপজিশনে থাকে আর এটি নিয়ন্ত্রিত হয় কোয়ান্টাম কণাদের দ্বারা। কোয়ান্টাম কণা, যেমন ইলেকট্রন, ফোটন—এমনকি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কিউবিট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এদের বিভিন্ন ধর্ম, যেমন চার্জ, স্পিন, ভরবেগ, অবস্থান, কম্পাঙ্ক ইত্যাদি ধর্মকে একসঙ্গে সুপারপজিশনে রেখে কিউবিটের মান স্থির রাখা যায়। একে বলে কোহেরেন্স; কিন্তু মুশকিল হলো, কিউবিটের এই মান খুব বেশি সময় একসঙ্গে ধরে রাখা যায় না। কারণ, পারিপার্শ্বিক তাপ, চাপ, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদির প্রভাবে কোয়ান্টাম কণারা ডিকোহের হয়ে যেতে পারে। এ জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে দিয়ে ঠিকঠাক কাজ করাতে হলে পরমশূন্য তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি পরিবেশে রাখতে হয়।

কোয়ান্টাম জেনো ইফেক্ট অবশ্য বিজ্ঞানীদের বিকল্প পথ দেখাচ্ছে। কোয়ান্টাম কণাদের ডিকোহেরেন্সে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে জেনো ইফেক্ট ব্যবহার করতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। সুতরাং জেনো ইফেক্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিতে বড় ধরনের প্রভাব রাখতে চলেছে, এটা বলাই যায়।

লেখক : সাংবাদিক

সূত্র : ফিজিকস ওয়ার্ল্ড

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



আবিষ্কারের কাহিনি

ইথার এবং একটি ব্যর্থ পরীক্ষা

আবুল বাসার

আলবার্ট মাইকেলসন নাছোড়বান্দার মতো উঠেপড়ে লাগলেন ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এডওয়ার্ড মর্লি। বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, সব চেষ্টার পরও তাঁরা ব্যর্থ হলেন। কিন্তু এই ব্যর্থতার হাত ধরে শুরু হলো পদার্থবিজ্ঞানের নতুন পথচলা...

জার্মানির রাজধানী বার্লিন থেকে ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমের ছোট্ট শহর পটসডাম। ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সামরিক ঐতিহ্য ও রাজকীয় আবাস হিসেবে পরিচিত শহরটি। হ্যাভেল নদীর তীরে গড়ে ওঠা পটসডাম ঘিরে আছে বিখ্যাত সব রাজপ্রাসাদ আর বাগবাগিচা। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় বেশ কটি স্বচ্ছ জলের হ্রদ। সবুজ গাছে ঢাকা ছোট ছোট টিলা, পাহাড় আর উপত্যকা শহরটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। তাই প্রুশিয়ার রাজা ও গণ্যমান্য লোকজন থেকে শুরু করে সাধারণ পর্যটকদের কাছে বেশ পছন্দের জায়গা এ শহর।

বিজ্ঞানীদের কাছেও পটসডামের গুরুত্ব কম নয়। শহুরে কোলাহল থেকে একটু দূরেই মনোরম টেলেগ্রাফেনবার্গ পাহাড়। সেখানে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পটসডাম অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরি—বিশ্বের প্রথম জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র। ১৮৭৮ সালে বানানো এই মানমন্দিরের মূল টাওয়ারের ঠিক নিচেই রয়েছে একটা বৃত্তাকার ঘর। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে সেটি। বাইরের কোনো শব্দ কিংবা কম্পন ঘরটাতে যাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিঘ্ন না ঘটায়, সে জন্য এর দেয়ালের পুরুত্ব রাখা হয়েছে এক মিটার।

নির্জন সেই ঘরটাকে ১৮৮০ সালে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বেছে নিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী আলবার্ট মাইকেলসন। পটসডামে তখন শীতকাল। বাইরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে। মাঝেমধ্যেই তুষার ঝরছে আকাশ থেকে। ঠিক এ সময় এই পাহাড়ি নির্জনতায় নিজের গবেষণা শুরু করলেন মাইকেলসন। নিজের হাতে বানানো যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসেছেন ঘরটিতে। আক্ষরিক অর্থেই পিতপতন নীরবতা সেখানে। তাই পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির মৃদু টুংটাং ছাপিয়ে নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একমাত্র আলোর উৎস মাইকেলসনের টিনের লণ্ঠন। তার মৃদু আলোও নিয়ন্ত্রিতভাবে আয়নায় ফেলছেন মাইকেলসন। বারবার মাপ নিচ্ছেন। টুকে নিচ্ছেন নোট খাতায়।

হিমশীতল বেজমেন্টে একে তো ভুতুড়ে পরিবেশ, তার ওপর প্রচণ্ড ঠান্ডায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতে টানা কয়েক মাস পরিশ্রম করে গেলেন এই তরুণ বিজ্ঞানী। একই পরীক্ষা করলেন অনেকবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ফল পেলেন, তা চোখ কপালে তোলার মতো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না মাইকেলসন। স্রেফ হতভম্ব হয়ে গেলেন এই মার্কিন বিজ্ঞানী। বুঝে উঠতে পারলেন না, ফলাফলটা কি যন্ত্রের ত্রুটির কারণে, নাকি অন্য কিছু? নাকি ইথার বলে আসলে কিছু নেই?

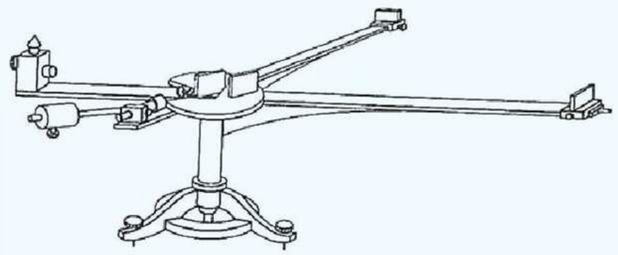
এই তো কমাস আগে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছুটি নিয়ে ইউরোপে এসেছেন মাইকেলসন। উদ্দেশ্য, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা। স্বদেশে কাজ করতেন মার্কিন নেভাল অবজারভেটরির অধীনে। সোজা কথায়, মার্কিন নৌবাহিনীতে। সহকর্মীদের চোখে মাইকেলসন ছিলেন 'অকাজের কাজি'। রাজধানী ওয়াশিংটন অফিসে তাঁর কাজকারবার ছিল পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু নৌবাহিনীর গোলাবারুদের লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ের চেয়ে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল আলোর চালচরিত্র নিয়ে। দিনরাত পড়ে থাকতেন আলোকবিদ্যা বা অপটিকস গবেষণায়। নৌ-কৌশলে দক্ষতা ছিল মোটামুটি, কিন্তু আলোকবিদ্যায় ছিলেন সবার সেরা। বিজ্ঞানে কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে আলোর গতি মাপার সমস্যাটি তাঁকে ভীষণ আকৃষ্ট করত। তাই একাডেমির সুপারিনটেনডেন্ট তাঁকে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে যদি এসব বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কম মনোযোগ দিয়ে নৌ-গোলাবারুদের দিকে একটু বেশি মনোযোগ দাও, তাহলে হয়তো একদিন তুমি দেশের কাজে লাগবে।'

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

কিন্তু সে কথা কানে না তুলে অপটিকস গবেষণায় আরও ঝুঁকে পড়েন মাইকেলসন। এভাবে ১৮৭৮ সালে, ২৫ বছর বয়সে তিনি আলোর গতি নির্ধারণ করেন ২৯৯,৯১০ ± ৫০ কিমি/সেকেন্ড। সেটা ছিল আগের যেকোনো পরিমাপের চেয়ে ২০ গুণ নির্ভুল। আলোর গতি মাপার এ সাফল্য দেশ-বিদেশে তাঁকে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, ইউরোপের অনেক বিজ্ঞানীর কাছেও মাইকেলসনের পরিচয় দাঁড়াল 'আলোর গতির সেই আমেরিকান' হিসেবে। এ সফলতা ও খ্যাতিই আরও গবেষণায় উৎসাহ জোগাল তাঁকে। এবার পিছু ধাওয়া করলেন ইথার-রহস্যের। একদম নাছোড়বান্দার মতো। সে যুগের বহুল আলোচিত ইথার তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে নতুন পরীক্ষার ফন্দি আঁটলেন। এর মাধ্যমে ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান তিনি। কারণ, সেকালে পদার্থবিদেরা ইথারের অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবে মেনে নিলেও এর পরীক্ষামূলক কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি কেউই। অসমাপ্ত কাজটাই করে দেখাতে চান মাইকেলসন।

সেটা করতে ছুটি নিয়ে ছুটে গেলেন জার্মানিতে। সেখানকার নামকরা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। খেটেখুটে একটা পরীক্ষার ডিজাইন করলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ডিজাইন থেকে শুরু করে সব তৈরি করলেন নিজ হাতে। যন্ত্রপাতি বলতে একটা ছোট্ট লণ্ঠন, দুটি আয়না আর টুকিটাকি কিছু জিনিস। যন্ত্রটার নাম দিলেন ইন্টারফিয়ারেন্সিয়াল রিফ্র্যাকটোমিটার। অবশ্য কবছর পর সেটা পরিচিত হয়ে উঠবে ইন্টারফেরোমিটার নামে। মাইকেলসন বিশ্বাস করতেন, এ পরীক্ষার মাধ্যমে ইথারকে হাতেনাতে প্রমাণ করা যাবে।

কিন্তু ১৮৮০ সালের শীতকালে পটসডাম মানমন্দিরে পরীক্ষায় পেলেন উল্টো ফল। তাতে মুষড়ে পড়লেন মাইকেলসন। সেটাই তাঁর ইথার প্রমাণের স্বপ্নটা স্রেফ গুঁড়িয়ে দিল। কিন্তু এই ইথারের ব্যাপারটা আসলে কী? একে প্রমাণের জন্য মাইকেলসনের এমন জান বাজি রেখে উঠেপড়ে লাগার কারণটাই-বা কী?



মাইকেলসনের বানানো বিশেষ ইন্টারফেরোমিটার

গতিশীল চুম্বকীয় বলক্ষেত্র কীভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে, তা দেখানো হয় এসব সমীকরণে। সমীকরণগুলো থেকে অদ্ভুত এক ব্যাপার খেয়াল করেন ম্যাক্সওয়েল। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি দেখেন, এর গতি আর আলোর গতি হুবহু এক (শূন্যস্থানে সেকেন্ডে প্রায় ৩ লাখ কিলোমিটার)। ব্যাপারটাকে কাকতালীয় ভেবে ফেলে দিতে পারলেন না; বরং অবিশ্বাস্য ফলাফলটা থেকে বৈপ্লবিক এক সিদ্ধান্তে আসেন ম্যাক্সওয়েল। বললেন, আলোও একপ্রকার বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। এভাবেই বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব ও আলোকে একসূত্রে বাঁধতে সক্ষম হন ম্যাক্সওয়েল।

কিন্তু এতে নতুন প্রশ্নেরও উদয় হলো। তরঙ্গ চলার জন্য মাধ্যমের দরকার। যেমন শব্দ চলে বাতাসের ভেতর দিয়ে। কাজেই শব্দ হলো বাতাসের চলমান তরঙ্গ। আবার সাগর-মহাসাগর বা পুকুরের ঢেউ হলো পানিতে চলমান তরঙ্গ। তাই প্রশ্ন ওঠে, আলোও যদি তরঙ্গ হয়, তাহলে আলো চলাচল করে কিসের মধ্য দিয়ে? এর চলার মাধ্যম কী?

সে উত্তর জোগাতে পদার্থবিজ্ঞানীরা একসময় একমত হলেন, এ ক্ষেত্রেও একটা বাহক আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটি কী? সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না। বিজ্ঞানীরা অজানা-অচেনা সেই বাহকের নাম দেন ইথার। বলা যায়, সেটা ছিল জোড়াতালি দেওয়া একটা সমাধান। তাই ইথার রয়ে গেল রহস্যময় এক পদার্থ। ইথার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বললেন, এর মধ্য দিয়েই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ চলাচল করে।

যুক্তির পিঠে যুক্তি সাজিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের অনুমান করে নিতে হলো, গোটা মহাবিশ্বটাই ইথারে ভরা। সে যুগের প্রভাবশালী বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বললেন, ইথার এমন এক পদার্থ, যা বাতাসের চেয়েও কোটি কোটি কোটি ভাগ হালকা। এই পদার্থ সেকেন্ডে ৪০০ মিলিয়ন মিলিয়ন বার কম্পিত হতে পারে। এর ঘনত্ব এত কম, যেকোনো বস্তু এর মধ্য দিয়ে চললেও তা কোনো বাধা পায় না। তা না হলে পৃথিবী বা অন্য গ্রহগুলো মহাকাশে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে কীভাবে!

কেলভিনের কথা মেনে নিলে বলতে হয়, ইথার একই সঙ্গে অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী ও অদৃশ্য। আবার সেটা স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ, ঘর্ষণহীন এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এমন পদার্থের ভেতরে গোটা মহাবিশ্বটা ডুবে থাকলেও কেউই একে দেখেনি, ছুঁতে পারেনি। এমনকি এর সঙ্গে ধাক্কাও খায়নি। এ রহস্যময় পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করতেই আটঘাট বেঁধে নামলেন মাইকেলসন। আরাগো অনুমান করলেন, পৃথিবীর গতির কারণে ইথারের মধ্য দিয়ে

সে যুগে ইথার ছিল এক অসম্ভব বস্তু—একটা রহস্যের নাম। নানা কারণে আলো ও ইথার নিয়ে বেশ একটা শোরগোল চলছিল বিজ্ঞানজগতে

২.

সে যুগে ইথার ছিল এক অসম্ভব বস্তু—একটা রহস্যের নাম। নানা কারণে আলো ও ইথার নিয়ে বেশ একটা শোরগোল চলছিল বিজ্ঞানজগতে। সতেরো শতকে আলোকে কণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন আইজ্যাক নিউটন। তাঁর খ্যাতির মতোই কণাতত্ত্বও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে। কালে কালে সেটাই জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। নিউটনের প্রায় সমসাময়িক বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেনস আলোকে তরঙ্গ হিসেবে প্রমাণ করলেন, কিন্তু সেটা হালে তেমন পানি পায়নি। প্রায় ২০০ বছর পর, উনিশ শতকের শুরুতে এসে আলো নিয়ে আবারও বিতর্ক শুরু হলো। এবার আলো যে তরঙ্গ, সে প্রমাণ দাখিল করলেন বিজ্ঞানী টমাস ইয়াং। প্রমাণটা ছিল বেশ শক্তপোক্ত। তাই বিজ্ঞানীরা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হন।

ওই শতকের মাঝামাঝিতে তরঙ্গতত্ত্ব সমর্থন করেন স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ১৮৬৩ সালের দিকে ৮টি সমীকরণে (পরে ৪টিতে সংক্ষেপ করা হয়) বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ধর্মগুলো বর্ণনা করেন ম্যাক্সওয়েল। গতিশীল বা পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক বলক্ষেত্র কীভাবে চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে এবং

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



আলবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড ডব্লিউ মর্লি

আলোর গতির পরিবর্তন হয় কি না, তা পরীক্ষা করতে নক্ষত্র থেকে আসা আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেই সময়ে পরীক্ষাটি বাস্তবায়ন করা যায়নি।

এদিকে মৃত্যুর কিছুদিন আগে, ১৮৭৯ সালের ১৯ মার্চ মার্কিন নেভিগেশনাল অ্যালম্যানাক অফিসের ডিরেক্টর ডেভিড পেক টডকে একটি চিঠি লেখেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি সেখানে ইথার প্রবাহ মাপার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ম্যাক্সওয়েলের মতে, পৃথিবীর কক্ষপথের গতি এবং আলোর গতির বর্গের অনুপাত এতই ক্ষুদ্র (১ কোটি ভাগের ১ ভাগ) যে তা মাপা অসম্ভব।

চিঠিটা মাইকেলসনও পড়েছিলেন। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না তিনি, বরং একে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিলেন। সেই কঠিন কাজই সম্ভব করে দেখাতে চাইলেন। অথচ নিজের দেশে এ রকম সূক্ষ্ম গবেষণার সুযোগ-সুবিধা তেমন ছিল না। আসলে সে যুগে যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা কিংবা উচ্চতর গবেষণার সুযোগ ছিল খুব সীমিত। তাই বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই পাড়ি জমাতেন ইউরোপে। সে দলে নাম লেখালেন মাইকেলসনও। ১৮৮০ সালের শরতে নিজের পরিবার, অর্থাৎ স্ত্রী ও দুই ছোট ছেলেসহ জার্মানির উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজে চেপে বসেন আলবার্ট মাইকেলসন।

৩.

প্রায় ২৬ বছর পর নিজের জন্মভূমি জার্মান সাম্রাজ্যে ফেরেন মাইকেলসন। রাজধানী বার্লিনে এসে সপরিবার থাকতে শুরু করেন ৫৪ কনিগগ্র্যাটজার স্ট্রাসে। ভর্তি হন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইউরোপের নামকরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা পড়াতেন জার্মানির শীর্ষ পদার্থবিদ হারমান ফন হেলমহোল্টজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে প্রাথমিক কাজ শেষ করে হেলমহোল্টজের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ক্লাসে যোগ দিতেন মাইকেলসন। আর বাড়িতে চর্চা করতেন গণিত ও মেকানিকস। তাঁর পরীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে হেলমহোল্টজের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাও করতে লাগলেন। হেলমহোল্টজ পরীক্ষার পদ্ধতির তাত্ত্বিক দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখে ত্রুটি খুঁজে পেলেন না। তবে তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বলে মন্তব্য করলেন তিনি। কিন্তু নাছোড়বান্দা মাইকেলসন সে সমস্যার সমাধানও বের করে ফেললেন কদিনের মধ্যে। পরীক্ষাগারে বরফ গলিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

তবে অর্থের অভাব তাঁর গবেষণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ সংকটে ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে আসেন টেলিফোনের উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। তিনি ভোল্টা ফাউন্ডেশন থেকে মাইকেলসনের প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন। তহবিল পেয়ে জার্মানির নামকরা কজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে এ ব্যাপারে সলাপরামর্শ করেন মাইকেলসন। একটা ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত হন, পরীক্ষাটা সফল হলে তা যুগান্তকারী হবে বটে, কিন্তু সফলতার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু সবাই তাঁকে চেষ্টা করে যেতে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেজমেন্টে একটি বিশেষ যন্ত্র ডিজাইন শুরু করেন মাইকেলসন। এই সেই ইন্টারফিয়ারেন্সিয়াল রিফ্র্যাকটোমিটার বা ইন্টারফেরোমিটার। যন্ত্রটা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও জোগাড় করে ফেলেন। পরীক্ষাটাকে এক অর্থে সরলই বলা চলে। তাঁর ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে আলোর খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন বা পার্থক্য মাপা যেত। যন্ত্রটা আসলে একটা উৎস থেকে আসা আলোকে একটি বিশেষ আয়না দুই ভাগে ভাগ করে দুটি আলাদা পথে পাঠায়। রশ্মি দুটি চলে পরস্পরের সমকোণে, অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রি কোণে। একটি রশ্মি চলত পৃথিবীর গতিপথের সমান্তরালে, অন্যটি চলত লম্বভাবে।

একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা দুটি আয়নায় রশ্মি দুটি প্রতিফলিত হয়ে আবারও ফিরে আসে। ফিরে এসে দুই রশ্মি আবার একত্র হয়। রশ্মি দুটি যদি একই দশায় থাকে, তাহলে একে অপরকে শক্তিশালী করে (উজ্জ্বল আলো)। মানে তাদের তরঙ্গশীর্ষগুলো এবং তরঙ্গপাদগুলো পরস্পর একই সময়ে মিলিত হলে পরস্পরকে শক্তিশালী করে। ফলে একটি উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। কিন্তু রশ্মি দুটি ভিন্ন দশায় থাকলে একে অপরকে দুর্বল বা বাতিল করে দেয় (অন্ধকার)। কারণ, তখন একটি তরঙ্গের তরঙ্গশীর্ষ অন্যটির তরঙ্গপাদের সঙ্গে মিলিত হয়। তাই তারা পরস্পরকে বাতিল করে দেয়। ফলে অন্ধকার অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। একেই বলে ইন্টারফিয়ারেন্স বা ব্যতিচার প্যাটার্ন। প্রথম প্যাটার্নকে বলা হয় গঠনমূলক ব্যতিচার এবং দ্বিতীয়টিকে বলে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার। এই আলো-অন্ধকারের প্যাটার্ন দেখে বোঝা যায় কোনো রশ্মির স্থানচ্যুতি বা পথ বদলেছে কি না; অর্থাৎ কোনো কিছুর কারণে খুব ছোট পরিবর্তন (যেমন কম্পন, গতি, চাপ) ঘটেছে কি না। ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রের মাধ্যমে রশ্মি দুটির যাত্রাকালের যেকোনো তারতম্য নির্ণয় করতে পারতেন মাইকেলসন।

এই বিজ্ঞানী জানতেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘণ্টায় প্রায় ১ লাখ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে। যুক্তি অনুসারে, পৃথিবীও ইথারের মধ্য দিয়ে একই গতিতে এগোচ্ছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ইথার স্থির মাধ্যম। কাজেই পৃথিবী এই গতিতে ইথারের মধ্যে চলার সময় একটি 'ইথার উইন্ড' বা ইথার বাতাসের সৃষ্টি হওয়ার কথা। বাতাসহীন শান্ত কোনো দিন রিকশা বা বাসে খুব জোরে চললে আপনার গায়ে বাতাসের চাপ অনুভূত হয়। বাতাস স্থির থাকলেও সেটা ঘটে আপনার গতির কারণে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও একইভাবে ইথার বাতাস সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করেছিলেন মাইকেলসন। তাই আলো ইথারের মধ্য দিয়ে চলার সময়ও এই ইথারের বাতাস আলোর গতিকে প্রভাবিত করার কথা।

মাইকেলসনের ইন্টারফেরোমিটার পরীক্ষায় একটি আলোকরশ্মি এই ইথার বাতাসের বিপরীতে চলছিল। ফলে এর গতি ও যাত্রাকাল অবশ্যই প্রভাবিত হওয়ার কথা। আরেকটি রশ্মি চলছিল ইথার বাতাসের সঙ্গে লম্বভাবে। তাই এর গতি তুলনামূলকভাবে কম প্রভাবিত হওয়ার কথা। কাজেই এ পরীক্ষায় এই দুই রশ্মির যাত্রাকালের যদি পার্থক্য পাওয়া যায়, তাহলেই প্রমাণিত হবে যে ইথারের অস্তিত্ব আছে।

ব্যাপারটা আরেকটু সহজ করা যাক। ধরুন, একটি নদীর প্রস্থ ১০০ ফুট। A এবং B নামের দুই সাঁতারু এই নদীতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। তবে প্রতিযোগিতাটা হবে একটু আলাদা নিয়মে। ধরা যাক, দুজনই প্রতি সেকেন্ডে ৫ ফুট গতিতে সাঁতার কাটতে পারে। নদীটিতে স্রোতের গতি সেকেন্ডে ৩ ফুট। দুই সাঁতারু নদীর তীর থেকে একই সঙ্গে সাঁতার কাটতে শুরু করল। কিন্তু একজন সাঁতারু স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কেটে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত (নদীর প্রস্থের সমান বা ১০০ ফুট) গিয়ে আবারও একই পথে শুরুর বিন্দুতে ফিরে আসবে। আরেকজন

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

নদীটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে (দূরত্ব ১০০ ফুট) গিয়ে আবারও আগের জায়গায় ফিরে আসবে। প্রশ্ন হলো, কে জিতবে?

মাইকেলসন সাঁতারের এ ধাঁধা ব্যবহার করেছিলেন ইথার পরীক্ষাটি বোঝাতে। দুই সাঁতারু এখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবার দুই সাঁতারুর জায়গায় দুটি আলোকরশ্মির কথা কল্পনা করুন। রশ্মি দুটি পরস্পরের সাপেক্ষে সমকোণে চলে এবং পরে আবার একত্র হয়। একজন সাঁতারু যেমন প্রথমে স্রোতের অনুকূলে এবং পরে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটে, ঠিক তেমনি একটি আলোকরশ্মি ইথার বাতাসের অনুকূল ও প্রতিকূলে চলে। অপরজন যেমন স্রোতের আড়াআড়ি সাঁতরে কেটে সোজা নদী পার হয়, তেমনি আরেকটি আলোকরশ্মি ইথার বাতাসের সাপেক্ষে লম্বভাবে চলে। এখন দুই সাঁতারুর দুজনেই যদি স্থির পানিতে ৫ ফুট/সেকেন্ড গতিতে সাঁতার কাটতে পারে, তাহলে তারা কে আগে ২০০ ফুট অতিক্রম করতে পারবে?

সাঁতারু A স্রোতের অনুকূলে ১০০ ফুট এবং স্রোতের বিপরীতে ১০০ ফুট সাঁতরে যায়। সাঁতারু B নদী পার হয়ে ১০০ ফুট এবং ফিরে আসতে আরও ১০০ ফুট বা মোট ২০০ ফুট দূরত্ব পার হয়। সাঁতারু A প্রথমে স্রোতের দিকে ১০০ ফুট যায়। কাজেই তার গতি হবে ৫ + ৩ = ৮ ফুট/সেকেন্ড। ফলে প্রথম ১০০ ফুট পার হতে তার সময় লাগে ১২.৫ সেকেন্ড। পরে স্রোতের বিপরীতে ফেরার সময় তার গতি হবে (৫ - ৩) = ২ ফুট/সেকেন্ড। এবার তার সময় লাগবে ৫০ সেকেন্ড। তাহলে A-এর ২০০ ফুট অতিক্রম করতে মোট সময় লাগবে ৬২.৫ সেকেন্ড।

সাঁতারু B সোজা নদী পার হয়, কিন্তু তাকে কোনাকুনি সাঁতার কাটতে হয়, যাতে স্রোতে ভেসে না যায়। পিথাগোরাসের সূত্রমতে, সে যদি সঠিক কোণে সাঁতার কাটে, তাহলে উজানের দিকে গতি হবে ৩ ফুট/সেকেন্ড। সেটাই স্রোতের প্রভাবের ক্ষতি পূরণ করে। নদী পারাপারের কার্যকর গড় গতি হবে ৪ ফুট/সেকেন্ড। ফলে ১০০ ফুট পাড়ি দিতে তার সময় লাগে ২৫ সেকেন্ড। ফিরে আসতেও লাগবে একই সময়; অর্থাৎ ২০০ ফুট অতিক্রম করতে B-এর মোট লাগবে ৫০ সেকেন্ড (নিচের ছবি)।

এ থেকে বোঝা যায়, স্থির পানিতে দুজনের সাঁতারের গতি একই হলেও স্রোতের বিপরীতে যাওয়া-আসায় বিজয়ী হবে সাঁতারু B। এ বিশ্লেষণ থেকেই মাইকেলসন ধারণা করলেন, ইথার বাতাসের বিপরীতে ও অনুকূলে চলা আলোর রশ্মির ভ্রমণ সময় হবে বেশি, আর ইথার বাতাসে লম্বভাবে চলা রশ্মির সময় হবে কম; অর্থাৎ ইথার বাতাসের বিপরীতে ও লম্বভাবে চলা আলোর রশ্মির যাত্রাকালেও পার্থক্য দেখা যাবে। ধারণাটা যাচাই করতেই পরীক্ষাটার নকশা করেছিলেন তিনি। সে জন্য সে যুগের সর্বোচ্চ মানের আলোর উৎস ও আয়না ব্যবহার করেন তিনি। সবকিছু খুব যত্ন নিয়ে স্থাপন করেন। যন্ত্রটির সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ও বাইরের কম্পনের প্রভাব কমাতে তিনি পুরো যন্ত্রটি পারদভরা পাত্রে ভাসিয়ে রাখেন।

কিন্তু বার্লিনে পরীক্ষাটা করতে গিয়ে আরেক দফা সমস্যায় পড়েন মাইকেলসন। এবার আর্থিক সংকট নয়, সমস্যাটা যন্ত্রের। তাঁর যন্ত্র এতই সংবেদনশীল যে আশপাশে যানবাহনের কম্পনও যন্ত্রে ধরা পড়তে লাগল। তাতে পরীক্ষাটা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এমনকি টিনের লণ্ঠন গরম হলে সৃষ্ট সামান্য তাপেও ব্যতিচার প্যাটার্ন স্থানচ্যুত হতো। আবার অবজারভেটরি থেকে ১০০ মিটার দূরের ফুটপাতে কেউ জোরে পা ফেললেই আলোর ব্যতিচার নকশা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেত! নিজের যন্ত্রের কর্মক্ষমতা দেখে নিজেই অবাক হলেন মাইকেলসন। এ সমস্যার সমাধান দিলেন হেলমহোল্টজ। তাঁর সুপারিশে যন্ত্রটি বার্লিন থেকে পটসডাম অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরিতে সরিয়ে নেওয়া হলো। এই পাহাড়ি নির্জনতায় মাইকেলসন অবশেষে স্থিতিশীল ব্যতিচার নকশা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন।

তবু শেষ হাসি হাসতে পারলেন না মাইকেলসন। দীর্ঘদিন পরিশ্রমে যে ফলাফল পাওয়া গেল, তা ছিল অপ্রত্যাশিত ও বিপ্লবী। কারণ, ব্যতিচার নকশায় কোনো স্থানচ্যুতি দেখা গেল না। মানে, দুটি আলোর রশ্মির ফিরে আসার সময়ের কোনো পার্থক্যই নেই। মাইকেলসনের জন্য সেটা ছিল চমকে দেওয়া ফল। শুরুতে তিনি ভেবেছিলেন, যন্ত্রের ত্রুটির কারণে এমন ফল আসছে কি না। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। নিজের পরীক্ষার ফল মেনে নিতে পারলেন না মাইকেলসন। ফলাফলটা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে ইথার বলে কিছুই নেই। ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভীষণ হতাশ হন তিনি। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নন মাইকেলসন। পরীক্ষাটা আবারও করার সিদ্ধান্ত নেন। সে জন্য যন্ত্রটাও আরেকটু উন্নত করার চেষ্টা করেন। এভাবে টানা ছয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেলেন তিনি। তবু পরীক্ষার ফলাফলে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। আবারও ব্যর্থ হলো পরীক্ষা। তাহলে কি ইথার বলে কিছু নেই? নাকি পরীক্ষায় কোনো ভুল হলো?

এসব ভাবতে ভাবতেই তাঁর ইউরোপে দুই বছরের ছুটি শেষ হয়ে গেল। ইথার সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা প্রায় অমীমাংসিত রেখে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে বাধ্য হন তিনি। তবে তখনই সিদ্ধান্ত নেন, যে করেই হোক, এ রহস্যের শেষ দেখে ছাড়বেন।

৪.

দেশে ফিরে নতুন করে পরীক্ষার জোগাড়যন্ত্র শুরু করলেন মাইকেলসন। আগের পরীক্ষায় ত্রুটি হতে পারে বলে অনুমান করলেন। কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝে উঠতে পারলেন না। ১৮৮১ সালে নৌবাহিনী থেকে পদত্যাগও করেন। দুই বছর পর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে কেজ স্কুল অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সে (বর্তমান কেজ ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির অংশ)। এবার আর পরীক্ষাটা একা করার সাহস পেলেন না। সঙ্গে নেন মার্কিন



ইথার সংক্রান্ত পরীক্ষাটা সহজভাবে বোঝাতে মাইকেলসন দুজন সাঁতারুর উদাহরণ ব্যবহার করেন

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

রসায়নবিদ এডওয়ার্ড ডব্লিউ মর্লিকে। পার্শ্ববর্তী ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন মর্লি। দুজনে যন্ত্রটি আরও উন্নত করে নতুন করে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন—এক-দুবার নয়, বারবার। কিন্তু প্রতিবারই মিলল একই ফলাফল। বলা ভালো, বারবারই ব্যর্থ হলো তাঁদের পরীক্ষা। কোনোভাবেই ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেল না।

ফলাফল দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল মাইকেলসন-মর্লির। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া দুজনের জন্যই ছিল কষ্টকর। তাঁরা অবাক হয়ে দেখতে পান, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, আলোর ওই দুটি রশ্মির মধ্যে কোনো দিকেই পুরো বছর বা দিনের কোনো সময়েই এ ধরনের কোনো পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে না। দুই ক্ষেত্রেই আলোর পথটুকু পাড়ি দিতে একই সময় লাগছে। আলো যেন যেকোনো দর্শক সাপেক্ষে সব সময় একই বেগে চলাফেরা করছে। অবশেষে ১৮৮৭ সালে, অনেকটা বাধ্য হয়ে ব্যর্থতা মেনে নেন তাঁরা। পরীক্ষাটার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেন মাইকেলসন-মর্লি। ফলাফল, ইথারের কোনো অস্তিত্ব নেই। সে বছর নভেম্বরে *আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্স* জার্নালে এ-সংক্রান্ত পেপারটা প্রকাশিত হলো। এর শিরোনাম ছিল : অন দ্য রিলেটিভ মোশন অব দ্য আর্থ অ্যান্ড দ্য লুমিনিফেরাস ইথার।

তাহলে কি আলো মাধ্যম ছাড়াই শূন্যে চলাচল করতে পারে? সেটা মেনে নেওয়া সে যুগের বিজ্ঞানীদের জন্য সহজ ছিল না। এ সময় দৃশ্যপটে এলেন আইরিশ পদার্থবিদ জর্জ ফিটজেরাল্ড এবং ডাচ পদার্থবিদ হেনড্রিক লরেঞ্জ। মাইকেলসন-মর্লির এই পরীক্ষার পর ইথারকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁরা। যথাক্রমে ১৮৮৯ ও ১৮৯২ সালে তাঁরা বললেন, ইথারের ভেতর দিয়ে চলার সময় বিভিন্ন বস্তু সংকুচিত হবে এবং তাতে ঘড়িও চলবে ধীরে। এই সংকোচন ও ঘড়ির ধীরগতি এমন হবে যে আলোর গতি মাপলে সব সময়ই একই পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে ইথারের সাপেক্ষে আলোর গতিতে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

ফিটজেরাল্ড ও লরেঞ্জের এ কথার মানে হলো, মাইকেলসন-মর্লি ইথারের সাপেক্ষে আলোর গতি মাপতে যে যন্ত্র ব্যবহার করেছেন, তা গতিপথের দিক বরাবর সংকুচিত হয়ে গেছে। আর এই সংকোচনের পরিমাণ ও আলোর গতিবেগ কমে যাওয়ার পরিমাণ এক। তাই দুটি ফলাফল পরস্পরকে বাতিল করায় ওই যন্ত্রে কোনো প্রভাব ধরা পড়েনি।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ইথার তত্ত্ব বাঁচাতে পারেননি ফিটজেরাল্ড আর লরেঞ্জ। কারণ, এর চেয়ে আরও যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য একটি ব্যাখ্যা ছিল। মাইকেলসন-মর্লির ব্যর্থ পরীক্ষাটাই যে আসলে একটা বৈজ্ঞানিক বিজয়, সেটা বুঝতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগে গেল প্রায় এক দশক। স্রেফ তাত্ত্বিক যুক্তির পিঠে যুক্তি সাজিয়ে এক যুবক বুঝে ফেললেন যে ইথারের আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। আসলে আলোর চলার জন্য ইথারের কোনো প্রয়োজনও নেই। সেই যুবকের নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে এভাবেই জন্ম নিয়েছিল বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব।

এ ব্যর্থ পরীক্ষার কারণে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান আলবার্ট মাইকেলসন—১৯০৭ সালে। তিনিই ছিলেন নোবেলজয়ী প্রথম মার্কিন বিজ্ঞানী। তাঁর সেই 'ব্যর্থ' পরীক্ষাটি দিয়েই শুরু হয়েছিল পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন যুগের জয়যাত্রা।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র : *দ্য মাস্টার অব লাইট : আ বায়োগ্রাফি অব আলবার্ট এ মাইকেলসন/* ডরোথি মাইকেলসন লিভিংস্টোন; *দ্য ইউনিভার্স ইন আ নাটশেল/* স্টিফেন হকিং; *আ ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম/* স্টিফেন হকিং; *আইনস্টাইনস কসমস/* মিচিও কাকু; *বিগ ব্যাং/* সাইমন সিং; *দ্য বিউটি অব ফলিং/* ব্লেডিয়া দ্য র‍্যাম বিগ থিঙ্ক ডটকম; নোবেল ডটঅর্গ; ব্রিটানিকা ডটকম; উইকিপিডিয়া

গণিতের সমস্যা ১০৩

শ্রেণি অনুসারে নিচের গণিতের সমস্যার সমাধান করে আমাদের কাছে পাঠান। সঠিক সমাধানদাতা তিনজন পাবেন রকমারি ডটকমের সৌজন্যে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই। খামের ওপর **গণিতের সমস্যা ১০৩** লিখুন। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে লিখুন।



প্রাইমারি

8! = 40320 সংখ্যক আট অঙ্কের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা রয়েছে, যেখানে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, প্রতিটি অঙ্ক ঠিক একবার ব্যবহৃত হয়। ধরা যাক, এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে যেগুলো 22 দ্বারা বিভাজ্য, তাদের সংখ্যা হলো N। N ও 2025-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

জুনিয়র

একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের অভ্যন্তরে একটি বৃত্ত এমনভাবে অন্তর্লিখিত আছে, যা এর চারটি বাহুকে স্পর্শ করে। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 3 এবং ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল 72। ধরা যাক, ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য r ও s, যেখানে $r \neq s$। $r^2 + s^2$-এর মান নির্ণয় করুন।

সাধারণ

সব ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n-এর যোগফল নির্ণয় করুন, যেন $n + 2$ রাশিটি $3(n + 3)(n^2 + 9)$ গুণফলটিকে ভাগ করে।

গণিতের সমস্যা ১০২-এর বিজয়ী

জিহাদুল ইসলাম, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
ফয়সাল মাহমুদ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
ইমরান হোসেন, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

গ্রন্থনা : **নাফিস তিহাম**, একাডেমিক সমন্বয়ক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ধাঁধা

অলিম্পিয়াড রহস্য



আইনস্টাইনের ধাঁধা বা আইনস্টাইনস রিডল। বলা হয়, মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এ ধরনের ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন। বাকি ৯৮ শতাংশই ভুল করেন। আপনি কোন দলে? ভালো কথা, মাথা খাটিয়ে সমাধান করতে পারলে রয়েছে বিশেষ পুরস্কার! তাহলে হয়ে যাক!

চার বন্ধু স্কুলের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। তারা পাশাপাশি বসে আছে প্রতিযোগিতার ফলাফলের অপেক্ষায়। প্রত্যেকে আলাদা বিষয়ে প্রতিযোগিতা করেছে। যেমন গণিত অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ও বায়োলজি অলিম্পিয়াড। ওদের প্রত্যেকের স্কুলব্যাগের রং আলাদা। পুরস্কারও পেয়েছে ভিন্ন—কেউ স্বর্ণপদক, কেউ রৌপ্যপদক, কেউ ব্রোঞ্জপদক, একজন পেয়েছে সান্ত্বনা পুরস্কার। এখন এই চার বন্ধু ও তাদের প্রতিযোগিতা-সম্পর্কিত ১১টি তথ্য এখানে দেওয়া আছে। সেগুলো ঘেঁটে আপনাকে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। প্রথমে তথ্যগুলো দেখা যাক—

১. যে রৌপ্যপদক পেয়েছে, সে বসেছে দ্বিতীয় স্থানে।
২. যে স্বর্ণপদক পেয়েছে, সে বসেছে প্রথম স্থানে।
৩. তানিয়ার কাছে কালো রঙের ব্যাগ।
৪. তৃতীয় স্থান পাওয়া প্রতিযোগীর আছে হলুদ রঙের ব্যাগ।
৫. রিফাত অংশ নিয়েছে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে।
৬. আমির বসেছে দ্বিতীয় স্থানে।
৭. যে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে, সে বসেছে ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীর পরে।
৮. যে সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছে, সে বসেছে যেকোনো এক পাশে।
৯. নীল ব্যাগ নিয়ে আসা ব্যক্তি বসেছে সবার শেষে।
১০. বায়োলজি অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া ব্যক্তিও বসেছে সবার শেষে।

এখন খুঁজে বের করুন :

গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছে কে?

এই ধাঁধা ধাপে ধাপে সমাধান করা খুব সহজ। চাইলে নিচের ছকের মতো একটা ছকও বানিয়ে নিতে পারেন।

ব্যাগের রং : কালো, হলুদ, সাদা, নীল
নাম : আমির, রিফাত, তানিয়া ও সাদিক
প্রতিযোগিতা : বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বায়োলজি অলিম্পিয়াড, গণিত অলিম্পিয়াড ও ফিজিক্স অলিম্পিয়াড
পুরস্কার : স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ ও সান্ত্বনা

বৈশিষ্ট্য	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
ব্যাগের রং				
নাম				
প্রতিযোগিতা				
পুরস্কার				

আইনস্টাইনের ধাঁধার গত সংখ্যার বিজয়ী

রুদমিলা, হাফরাস্তা, নাটোর
মাহিমা তাবাসসুম, বরেন্দারা মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মো. আব্দুল্লাহ আল মিরাজ, মুন্সিপাড়া, রংপুর

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।



ঝটপট গণিত
সহজ কলাকৌশল
কাজী আকাশ
বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে ৩০ দিনে সবাই শেষ করতে পারেন। এক মাস পরে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সমাধান করা যাবে নিমেষে।
৳ ৩০০
ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯
প্রথমা
কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD



ইতিহাসের প্রাচীনতম মানচিত্রের নেপথ্যে

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

আজকাল আমরা মোবাইলের 'ম্যাপস' অ্যাপ খুললেই মানচিত্র পেয়ে যাই। স্যাটেলাইট ব্যবহার করে দূরত্ব নির্ণয় ও ছবি তোলার মাধ্যমে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়। কিন্তু এককালে স্যাটেলাইট ছিল না। হাজার বছর আগে সাধারণ এক গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করে মানুষ তৈরি করেছিল প্রথম মানচিত্র...

সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা... ঠিক এভাবে সাধারণত রূপকথার গল্প শুরু হয়। কিন্তু এটা রূপকথার গল্প নয়। তবে রূপকথার চেয়ে কমও নয়! নতুন কোথাও যেতে হলে আমরা চট করে 'ম্যাপস'-এর সাহায্য নিই। ম্যাপস মানে গুগল ম্যাপস। পকেটেই থাকে, স্মার্টফোনে। অচেনা রাস্তা? অচিন শহর? তাতে কী? স্মার্টফোন বের করে ম্যাপস অ্যাপটা চালু করলেই হলো। চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাস্তাঘাট, অলিগলি। চাইলে স্যাটেলাইট থেকে তোলা 'প্রায় লাইভ' ছবিও দেখা যায়। গুগল এখন রিয়েল টাইম বা তাৎক্ষণিক আপডেটও দেয়। কোথাও রাস্তা বন্ধ, জ্যাম বা কোনো সমস্যা—সব জানা যায় চট করে। বিদেশবিভুঁইয়ে বেড়াতে গেলে তাই এখন আর অতটা সমস্যায় পড়তে হয় না।

এককালে বিষয়টা এমন ছিল না। সেই সময়, যখন এসব ছিল না, তখন মানুষ কীভাবে পথ খুঁজে নিত? কীভাবে মানুষ প্রথম পৃথিবীর ছবি বা মানচিত্র আঁকার কথা ভাবল?

এ গল্প মানুষের কৌতূহলের এবং বিজ্ঞানের। সে গল্পই আজ বলব। চলুন, শুনে আসি পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র তৈরির গল্প।

২

সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা। মানুষ তখন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসবাস করত। তাদের পৃথিবীটাও ছিল খুব ছোট, নিজেদের গ্রাম বা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দূরের বিভিন্ন দেশ বা সাগর-নদীর কথা তারা কেবল লোকমুখে শুনত। এই লোকেরা কারা? তারা মূলত বণিক। ব্যবসার খাতিরে ঘুরে বেড়াত দেশ থেকে দেশান্তরে।

চলাফেরার জন্যই শুধু নয়, নিজেদের গ্রাম, শহর বা দেশের কোথায় কী আছে, সেসব জানার জন্যও কিছু একটা প্রয়োজন। এমন কিছু, যেটা একনজর দেখেই বোঝা যাবে, কোথায় কী আছে। এই তাড়নাটুকু মানুষ অনুভব করেছিল। এ তাড়না থেকেই জন্ম নেয় মানচিত্রের ধারণা।

কিন্তু ইতিহাসে প্রথম এককভাবে কেউ মানচিত্র তৈরি করেছেন—এমন বিশেষ কারও কথা জানা যায় না। বরং ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন শহর ও সভ্যতার মানুষেরা নিজেদের মতো করে মানচিত্র তৈরি করেছেন।

ইতিহাসের প্রাচীনতম যে মানচিত্রগুলোর কথা জানা যায়,

মানচিত্রে ত্রিকোণমিতির ব্যবহার

কীভাবে প্রাচীন সমীক্ষক বা সার্ভেয়াররা একটি অঙ্কিত ত্রিভুজের কোণ ব্যবহার করে নির্ভুল বিন্দু ও দূরত্ব পরিমাপ করতেন, তার একটি উদাহরণ দেখানো হলো।

১. পাহাড়ি অঞ্চল থেকে দূরত্ব পরিমাপ
ত্রিকোণমিতি ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকার ওপর একাধিক (কাল্পনিক) ত্রিভুজ আঁকা হয়। বড় এলাকা জরিপের জন্য পাহাড়ি অঞ্চল এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। কারণ, এখান থেকে অনেক বেশি দূরত্বজুড়ে বিভিন্ন জিনিস ও রেফারেন্স পয়েন্ট বা প্রসঙ্গ-বিন্দু দেখা যায়।

৭. সাইনের সূত্র
ছবির দুটি জায়গা এবং দুর্গটির মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করার জন্য সাইনের (sine) সূত্র ব্যবহার করা হয়। এই সূত্র অনুযায়ী, একটি ত্রিভুজের যেকোনো বাহুর দৈর্ঘ্য এবং তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাত ত্রিভুজটির সব বাহু ও কোণের জন্য সমান থাকে। সাইন একধরনের ত্রিকোণমিতিক ফাংশন, এর মাধ্যমে ত্রিভুজের লম্ব ও অতিভুজের অনুপাত বের করা যায়।





জরিপকারী যখন থিওডোলাইটকে নতুন ফোকাস বিন্দুর দিকে ঘোরান, তখন দূরবর্তী অবস্থানগুলোর মধ্যবর্তী কোণটি পরিমাপ করা যায়।

৩. অজানা দৈর্ঘ্য
ছবিতে দুর্গ এবং অন্য দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অজানা। এই দূরত্বগুলো একবার নির্ণয় করা গেলে এই রেখাগুলো তখন আবার সংলগ্ন ত্রিভুজাকার অঞ্চলগুলোর মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে নতুন ভিত্তি হয়ে উঠবে।

৬. অজানা কোণ
দূরবর্তী বা দুর্গম কোনো জায়গার অজানা কোণটি অন্য দুটি জানা কোণ ব্যবহার করে হিসাব করা যায়। কারণ, একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল সব সময় ১৮০ ডিগ্রি হয়।

২. ভিত্তি
অন্য অজানা দূরত্বগুলো বের করার জন্য ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য মেপে নেওয়া হয়। এটি 'জানা দূরত্ব' বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইংরেজিতে একে 'বেজলাইন' বলে।

৫. থিওডোলাইট পরিমাপ
দূরবর্তী বিন্দু এবং ভিত্তিরেখার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দুটি কোণ থিওডোলাইট নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করে পরিমাপ করা হতো সেকালে। এটি একটি চলমান দুরবিন, কৌণিকভাবে ডিগ্রি চিহ্নিত অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে।

৪. অনুকূল কোণ
ভূমি জরিপের জন্য তখনই ত্রিভুজ ব্যবহার করা যায়, যদি এর কোণগুলোর প্রতিটি ৩০ ডিগ্রির চেয়ে বড় এবং ১২০ ডিগ্রির চেয়ে ছোট হয়।

তার মধ্যে ব্যাবিলনে পাওয়া একটি মানচিত্র উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এই মানচিত্র কিন্তু আজকের কাগজের মানচিত্রের মতো নয়। নরম মাটির চাকতিতে খোদাই করে তৈরি ওটা। গবেষকেরা বলেন, এই মানচিত্র একধরনের সিম্বলিক বা রূপক মানচিত্র; বাস্তব নয়। এমনটা বলার কারণ আছে। এ মানচিত্রে ব্যাবিলনকে দেখা যায় একদম কেন্দ্রে। এর কারণ, ব্যাবিলনের মানুষ নিজেদের শহরকে ভাবত পৃথিবীর কেন্দ্র। সে জন্যই তাদের মানচিত্রে ব্যাবিলন শহরটা মাঝখানে আর তাকে ঘিরে একটা নদী। সেই নদীর ওপারে কিছু কাল্পনিক দ্বীপের ছবিও আছে। অথচ ওতে পারস্য (আজকের ইরান) ও মিসরের চিহ্নও নেই। কিন্তু এই দুটি সভ্যতার কথা ব্যাবিলন যে শুধু জানত, তা-ই নয়, তাদের সঙ্গে লেনদেন এবং যুদ্ধ হয়েছে সভ্যতাটির। ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এই মানচিত্রই আমাদের জানা প্রথম 'ওয়ার্ল্ড ম্যাপ'।

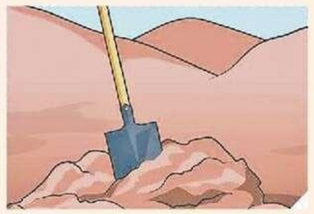
ব্যাবিলনেই আরও প্রাচীন কিছু 'স্থানীয়' মানচিত্র পাওয়া গেছে। এ রকম একটি মানচিত্র পাওয়া যায় ১৯৩০ সালে, গা-সুরে। এই এলাকা বর্তমান উত্তর ইরাকের কার্কুক শহরের

Job Solution BD
Click Here to join the Channel
Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

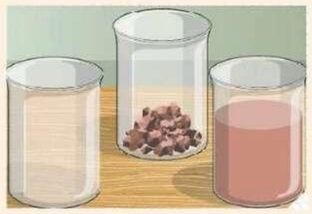
ব্যাবিলনীয় মাটির ফলকে তৈরি মানচিত্র

উপযুক্ত উপাদান খোঁজা থেকে শুরু করে সুনির্দিষ্টভাবে খোদাই করা পর্যন্ত প্রথম মানচিত্রগুলো ছিল বিশাল কর্মযজ্ঞ



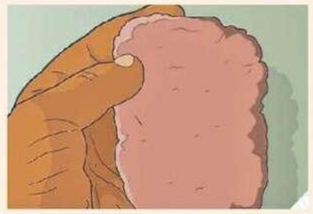
১. কাদামাটির উৎস

বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি ও নদীতীরে প্রচুর কাদামাটি পাওয়া যেত। ব্যাবিলন শহরের ঠিক উত্তরে অবস্থিত এ সমভূমিকে বলা হতো ইডেন। এখানে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বেশির ভাগ স্থাপত্য ও নানা ধরনের মন্দির নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত কাদামাটি ছিল।



২. পরিশোধন

পানির সঙ্গে মেশালে কাদামাটি তরল হয়ে যেত। সেটা থিতিয়ে পড়ার জন্য রেখে দেওয়া হতো, যাতে বালুর মতো অপদ্রব্যগুলো নিচে জমে কাদামাটি থেকে আলাদা হয়ে যায়। ওদিকে কাদামাটি আর্দ্র ও ভাস্কর্য তৈরির উপযোগী থেকে যেত।



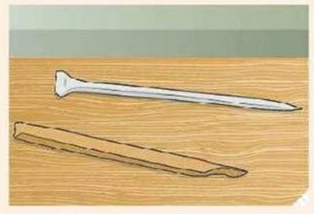
৩. ফলকের আকার দেওয়া

কাদামাটির ঘনত্ব সব জায়গায় সমান রাখার জন্য প্রথমে ওটাকে মন্থন করা হতো। কাদামাটি যথেষ্ট শুকিয়ে গেলেও নমনীয় থাকত, তখনো এটিকে যেকোনো আকার ও পুরুত্বের মানচিত্রে রূপ দেওয়া যেত।



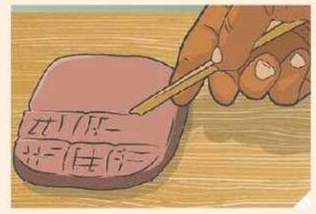
৪. নলখাগড়া নির্বাচন

প্রাচীন মানচিত্র খোদাই করার জন্য লেখনী বা স্টাইলাস তৈরি করতে নানা প্রজাতির নলখাগড়া ব্যবহার করা হতো। তবে এর শক্ত ডাঁটা ও জলরোধী আবরণের কারণে বিশাল আকারের নলখাগড়াই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত।



৫. কিউনিফর্ম তৈরি

কীলক আকৃতির স্টাইলাস দিয়ে কাদামাটির ওপর ব্লকের মতো অক্ষর খোদাই করা হতো, যাকে বলা হতো কিউনিফর্ম। নলখাগড়া ও হাড়—উভয় সরঞ্জামই প্রচলিত ছিল এবং এর ত্রিভুজাকার ডগা কাদামাটির ওপর আঁকা সহজ ও কার্যকর করে তুলেছিল।



৬. মানচিত্র চিহ্নিতকরণ

স্টাইলাসের নকশার কারণে এ প্রাচীন মানচিত্রগুলোর অনেক বিন্দু ত্রিভুজ আকারে চিহ্নিত করা হতো। খোদাই করার কাজটি এমন সময় করতে হতো, যখন কাদামাটি তার আকৃতি ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু খোদাই করার মতো নরম রয়েছে।

কাছে। এই মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটা 'রিভার ভ্যালি'—নদীসৃষ্ট নিচু ভূমি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২৫ হাজার অব্দের এ মানচিত্র প্রাচীনতম মানচিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ রকম চেক রিপাবলিক, অস্ট্রেলিয়াসহ কিছু অঞ্চলের প্রায় একই সময়ের মানচিত্র পাওয়া গেছে। তবে এগুলো স্থানীয় মানচিত্র, বৈশ্বিক নয়।

ব্যাবিলনের পর বিশ্বকে ভালোভাবে মানচিত্রে তুলে আনার চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যান্ডার। সেটা খ্রিষ্টপূর্ব ৬১০ থেকে ৫৪৬ অব্দের কথা। তাঁর মানচিত্রে পৃথিবীকে দেখানো হয়েছে সিলিন্ডার আকারের। এ মানচিত্রের জন্য নাবিক ও বণিকদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করেন অ্যানাক্সিম্যান্ডার। কোথায় কোন নদী, কোথায় পাহাড়, এক শহর থেকে আরেক শহরের দূরত্ব কত—এসব তথ্য মিলিয়ে তিনি মানচিত্রটি তৈরি করেন। কালের খেরোখাতায় এটি হারিয়ে যায়। তবে ঐতিহাসিকদের লেখায় জানা যায় এর কথা।

এখানে ভূবিজ্ঞানের একটা মজার বিষয় বলা উচিত। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মানচিত্র গোল না হলেও সিলিন্ডার আকার পেয়েছে। কারণ, তিনি গোটা বিশ্বকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। দিগন্তের বেঁকে যাওয়া, বিভিন্ন জায়গার মধ্যকার দূরত্ব ইত্যাদি হিসাব কষে তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবীটা সমতল নয়। বক্র। তবে এটি যে গোলকাকার, তা তিনি বুঝতে পারেননি। ওদিকে স্থানীয় মানচিত্রগুলো ছিল একদম সমতল। কারণ, শুধু চোখের দেখায় আশপাশের অঞ্চলে বক্রতার বিষয়টি সহজে চোখে যেমন পড়ে না, তেমনি প্রয়োজনও হয় না এলাকা চেনার জন্য।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার মাথায় প্রশ্নটা একবার হলেও উঁকি দিয়ে গেছে। প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা কীভাবে বড় বড় এলাকা, পাহাড় বা নদীর দূরত্ব মাপতেন? এখানেই বিজ্ঞানের আসল কেরামতি।

৩

প্রাচীন মানচিত্রকারেরা বড় বড় এলাকার দূরত্ব মাপার জন্য দুটি অসাধারণ কৌশল ব্যবহার করতেন।

এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো কম্পাস। প্রথম কম্পাস আবিষ্কৃত হয় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, চীনে। হ্যাঁ, কম্পাসও যথারীতি 'মেড ইন চায়না'!

এই কম্পাস আবিষ্কারের ফলে দিক নির্ণয় অনেক সহজ হয়ে যায়। নাবিকদের আর সব সময় আকাশে চোখ রেখে হিসাব কষে বোঝার চেষ্টা করতে হতো না, জাহাজ কোন দিকে যাচ্ছে। মানুষ সহজে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চিনতে শুরু করল। ফলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার অবস্থান বোঝা এবং তাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা অনেক সহজ হয়ে পড়ে।

> প্রথম কম্পাস আবিষ্কৃত হয় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, চীনে। হ্যাঁ, কম্পাসও যথারীতি 'মেড ইন চায়না'!

কিন্তু কম্পাস তো প্রাচীনতম মানচিত্রের প্রায় ৪০০ বছর পরের কথা। এর আগে? কী করত মানুষ? এ বিষয় পড়ানো হয় গণিত বইয়ে আর অনেকেই খানিকটা ভয়, খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চায়। ঠিক ধরেছেন, এর নাম ত্রিকোণমিতি। তিন কোণের হিসাব-নিকাশ। পাঠ্যবইয়ে বহু দূরের কোনো গাছ ঝড়ের কারণে ভেঙে যাওয়াবিষয়ক যেসব গণিত দেখে অনেকে বিরক্ত হয়, সেই গণিতই আসলে প্রাচীন মানচিত্রের পেছনের 'গোপন জাদু'। শুধু তা-ই নয়, এই ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে ইরাটোস্থেনিস নিজের এলাকায় বসে পুরো পৃথিবীর ব্যাস মেপে ফেলেছিলেন! ভাবা যায়!

বাস্তবে ত্রিকোণমিতি কিন্তু খুব মজার। ধরুন, আপনি কোনো নদীর এক পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওপারে একটা বড় গাছ দেখা যাচ্ছে। ওই গাছের কাছে না গিয়েই খানিকটা ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে আপনি চাইলে বের করে ফেলতে পারবেন নদীটা কতখানি চওড়া। সে জন্য আপনাকে নদীর পাড় বরাবর দুটি বিন্দু ঠিক করতে হবে। এরপর প্রতিটি বিন্দু থেকে ওই গাছের কৌণিক অবস্থান মাপতে হবে। এরপর শুধু সূত্রে ফেলা, ব্যস! (সত্যি সত্যি সূত্রে বসিয়ে অঙ্ক কষব না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। বিষয়টা বুঝলেই চলবে।)

প্রাচীন সার্ভেয়ার, মানে ভূমি জরিপকারেরা ঠিক এ কাজই করতেন। তাঁরা পুরো এলাকাকে মনে মনে কতগুলো ত্রিভুজে ভাগ করে নিতেন। তারপর কয়েকটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব মেপে এবং কোণ নির্ণয় করে বাকি বিশাল এলাকার মাপজোখ কাগজে-কলমে হিসাব করে বের করে ফেলতেন। কাজটা কঠিন, সময়সাপেক্ষও বটে; কিন্তু এর ফলেই প্রথমবারের মতো বড় আকারের এবং তুলনামূলকভাবে নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল।

ধীরে ধীরে মানচিত্র উন্নত হতে থাকে। মধ্যযুগে, প্রায় ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে আঁকা এ রকম একটি বিখ্যাত মানচিত্রের নাম 'ম্যাপা মুন্ডি' (Mappa Mundi)। লাতিন এই শব্দগুচ্ছের ইংরেজি অর্থ 'ম্যাপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড', মানে বিশ্বের মানচিত্র। এটার মূল উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল ধর্মীয় নানা দিক তুলে ধরা। কাজেই বিশ্বের মানচিত্রে দেখা মেলে স্বর্গ-নরকের। আর এর কেন্দ্রে? কেন্দ্রে ছিল জেরুজালেম। কারণটা বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

এরপর আরব ভূগোলবিদ ও বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত ও নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও দূর সমুদ্রযাত্রায় তাঁদের এসব মানচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এভাবে হাজার বছর ধরে মানচিত্র উন্নত হতে হতে আমরা পেয়েছি আজকের গুগল ম্যাপস। অবিশ্বাস্য না?

কিন্তু আজ যখন আমরা গুগল ম্যাপস ব্যবহার করি, আমাদের মনে পড়ে না—মানুষের হাজার বছরের প্রচেষ্টা ও সফলতার এক আশ্চর্য স্বাক্ষর আমরা পকেটে করে বয়ে বেড়াচ্ছি। প্রতিদিন না হলেও মাঝেমধ্যে আমাদের এই কথাগুলো ভাবা উচিত, বিস্মিত হওয়া উচিত। এ অতীত স্মৃতি, শিকড়, বিস্ময় ও কৌতূহলই তো আমাদের পরিচয়, এগিয়ে যাওয়ার দিক-দিশা।

লেখক : সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা
সূত্র : *হাউ ইট ওয়ার্কস*, উইকিপিডিয়া

স্কলাস্টিকায় আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান কার্নিভ্যাল

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী করতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান কার্নিভ্যাল। গত ২০-২২ জুন রাজধানীর মিরপুরের স্কলাস্টিকার সিনিয়র ক্যাম্পাসে এ কার্নিভ্যাল আয়োজিত হয়। মোট তিন ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থীরা এই কার্নিভ্যালে অংশ নেয় সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা জুনিয়র ক্যাটাগরিতে, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে এবং সিনিয়র ক্যাটাগরিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। এ কার্নিভ্যালে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল নানা ধরনের প্রতিযোগিতা। যেমন ম্যাথমেটিকস অলিম্পিয়াড, জেনারেল সায়েন্স অলিম্পিয়াড, ক্যালকুলাস ও অ্যারিথমেটিক অলিম্পিয়াড, রোবোটিকস অলিম্পিয়াড, স্পেস অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডসহ অনেক আয়োজন। পাশাপাশি ছিল সুডোকু প্রতিযোগিতা, এক্সটেম্পোর স্পিচ, আইকিউ টেস্ট ও তাৎক্ষণিক যুক্তিবিদ্যার পরীক্ষা। প্রতিযোগিতায় দেশের ৪০টি স্কুল থেকে ৪০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী সরাসরি অংশ নেয়। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয় অনলাইনে। এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় ২৩০ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

মিতুলের বিজ্ঞান শেখা



ক্লাস থ্রিতে পড়ে মিতুল। সারাক্ষণই তার মাথায় নানান প্রশ্ন। "আলো কীভাবে চলে?", "চুম্বক কীভাবে জিনিস টেনে নেয়?", "আকাশ কেন নীল?"- এরকম আরও কত শত প্রশ্ন! একদিন সে তার আম্মুর কাছে আবদার করলো, "আম্মু, আমাকে বিজ্ঞানবাক্স কিনে দাও না প্লিজ!"
মা বললেন, "আচ্ছা, ফাইনাল পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে বিজ্ঞানবাক্স কিনে দেব।" মিতুলের উৎসাহ তখন বেড়ে গেলো বহুগুণ। ফাইনাল পরীক্ষায় মিতুলের রেজাল্ট খুব ভালো হলো। মা তার কথা রেখেছিলেন। মিতুল পেলো তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার। তাকে দেয়া হলো আলোর ঝলক ও চুম্বকের চমক বিজ্ঞানবাক্স।

বাক্স খুলেই শুরু হলো মিতুলের নিত্য নতুন আবিষ্কারের অভিযান। আলোর বিস্ময়কর সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে একের পর এক পরীক্ষা চালাতে লাগলো সে। একেকটা নতুন জিনিস বানায় আর আনন্দে তার চোখ ঝলমল করে ওঠে!

একটু পর পর সে যা শিখেছে তা আম্মুকে জানানো চাই!

"আম্মু, দেখো দেখো, আলো সোজা পথে চলে!"

"আম্মু, জানো, আলোও ঘুরে যায়!"

"দেখো, আমি বানিয়েছি পেরিস্কোপ!"

"দেখো চুম্বকের বিকর্ষণের শক্তি!!"

এভাবে মিতুলের এক্সপেরিমেন্ট দেখতে দেখতে মা নিজেই হয়ে গেলেন ছাত্র, আর মিতুল হয়ে উঠলো একজন ছোট্ট বিজ্ঞান শিক্ষক! এখন নতুন কিছু শিখলে মিতুল তার মাকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, আর মা অবাক হয়ে ভাবেন এই ছোট্ট ছেলেটা কত কিছু শিখেছে, কত বড় হয়ে গেছে!
নিজের হাতে সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করে মিতুলের শেখার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেলো। এখন সে বিজ্ঞানবাক্সের বাইরের বিষয় নিয়েও ভাবে। মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া ঘোরে তার।

আমরা বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানের প্রতি মিতুলের এই ছোট বয়সের অসাধারণ উৎসাহ একদিন তাকে বড় বিজ্ঞানী হতে সাহায্য করবে। মিতুল এবং তার মতো কৌতূহলী শিশুরাই তো আগামীর বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।
বিজ্ঞানবাক্সের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে আগামীর বাংলাদেশ, গড়ে উঠবে অন্যরকম প্রজন্ম!

গড়ে উঠছে অন্যরকম প্রজন্ম

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

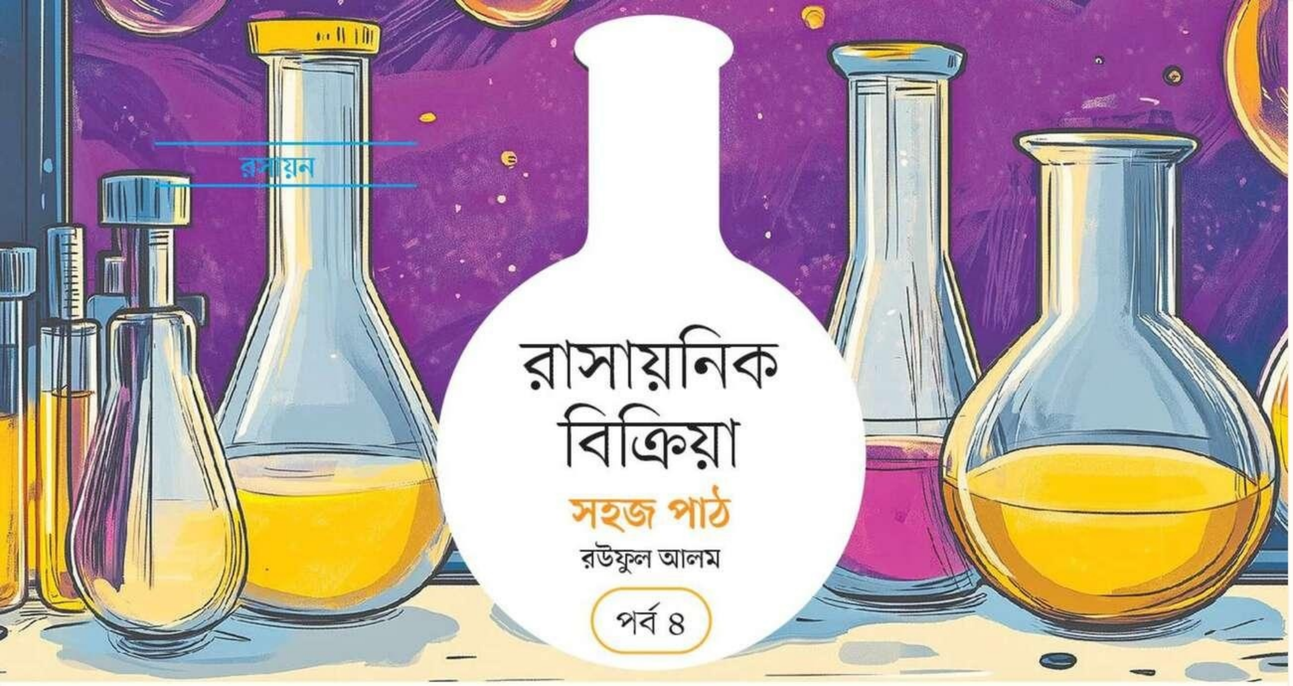
meena bazar bringing freshness to your life
রকমারি.com www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD



রাসায়নিক বিক্রিয়া

সহজ পাঠ

রউফুল আলম

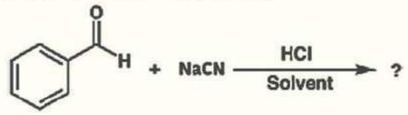
পর্ব ৪

রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশেষত জৈব রসায়নের বিক্রিয়া বুঝতে যে বিষয়গুলো জানতে হবে, সেগুলো সহজ ভাষায় ও একজন রসায়নবিদের কলমে...

এ পর্বে বেশ কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণের মাধ্যমে আগের আলোচিত ইলেকট্রোফাইল, নিউক্লিওফাইল, ইলেকট্রন দাতা গ্রুপ ও ইলেকট্রন উত্তোলনকারী গ্রুপ সম্পর্কে আবার তুলে ধরব। এতে শিক্ষার্থীরা আরও সহজে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাবে।

যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে হলে আগের আলোচিত বিষয়গুলো স্মরণ রেখে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন করতে হবে। বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল বা মেকানিজম বুঝতে হলে যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন করে খুঁজতে হবে উত্তর। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল মুখস্থ করার বিষয় নয়; বরং যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও চর্চার মাধ্যমে উপভোগের বিষয়।

একটা উদাহরণ দিই। মনে করো, নিচের বিক্রিয়াটি থেকে কী যৌগ বা উৎপাদ (Product) পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। একটা বিক্রিয়া থেকে একের বেশি উৎপাদও পাওয়া যেতে পারে বা পাওয়া যায়। শুরুতে আমরা সহজ ও সাধারণ উদাহরণ দেখি।



এ ধরনের একটা বিক্রিয়া দেখার পর শুরুতেই আমরা ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রশ্ন করব। তারপর খণ্ড খণ্ডভাবে উত্তর বের করে সেই উত্তরগুলো জোড়া দিলেই পূর্ণাঙ্গ উত্তর পেয়ে যাব।

ওপরের বিক্রিয়ায় একটা অ্যালডিহাইড আছে। আর আছে সোডিয়াম সায়ানাইড। এ দুটি যৌগ বা বিকারক একটি দ্রাবকে মেশানো হলো। তাহলে মিশ্রণের পর আমরা কী পাব? কোন যৌগ বা উৎপাদ পাব?

প্রথমেই প্রশ্ন করব, ইলেকট্রোফাইল কোনটি? এখানে ইলেকট্রোফাইল হলো অ্যালডিহাইড। কার্বন-অক্সিজেন দ্বিবন্ধন, তথা কার্বনিলের কার্বন। কার্বনে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে, তাই এটি ইলেকট্রন গ্রহণের জন্য আগ্রহী বা ইলেকট্রনের প্রতি আসক্ত অথবা ইলেকট্রোফাইল।

আমরা তাহলে ইলেকট্রোফাইল পেয়ে গেলাম। এখন প্রশ্ন করব, নিউক্লিওফাইল কোনটি? কারণ, ইলেকট্রোফাইল থাকলে নিউক্লিওফাইল থাকবেই। এ ক্ষেত্রে যেহেতু শুধু সোডিয়াম সায়ানাইড আছে, তাহলে সোডিয়াম সায়ানাইড হলো নিউক্লিওফাইল। সোডিয়াম সায়ানাইডকে যদি আমরা আরও সহজভাবে প্রকাশ করি, তাহলে এটা বস্তুত সোডিয়াম আয়ন ও সায়ানাইড আয়ন আকারে দেখানো যায়। অনেকটা সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের মতো। সোডিয়াম সায়ানাইডে সায়ানাইড আয়নই হলো নিউক্লিওফাইল, যেহেতু এটা ঋণাত্মক চার্জ বা অতিরিক্ত ইলেকট্রন বহন করে।

আমরা ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইল চিহ্নিত করেছি। আমরা জানি, ইলেকট্রোফাইল হলো ইলেকট্রন গ্রহীতা এবং নিউক্লিওফাইল হলো ইলেকট্রন দাতা। তাহলে সেভাবেই অঙ্কন করে প্রকাশ করব।



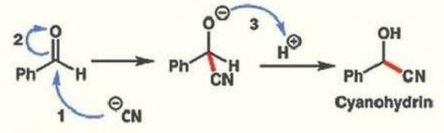
ওপরের চিত্রে প্রথম অ্যারো চিহ্ন বা বক্র তির চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, সায়ানাইড এক জোড়া ইলেকট্রন দিচ্ছে কার্বনিল কার্বনে। ফলে কার্বন-অক্সিজেনের একটা বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে। সেটা দ্বিতীয় অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। একটা বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে এবং আরেকটা নতুন বন্ধন তৈরি হয়েছে। নতুন বন্ধনকে লাল রং ব্যবহার করে হাইলাইট করা হয়েছে। আগেই বলেছি, এ ধরনের অঙ্কনকে বলা হয় 'পুশ-পুল মেকানিজম'। সারা বিশ্বের রসায়নবিদেরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

কার্বন-অক্সিজেনের একটি বন্ধন ভেঙে যাওয়ায় অক্সিজেন মূলত অক্সাইড আয়নে পরিণত হয়েছে। সেটা ঋণাত্মক আয়ন। যেহেতু বিক্রিয়ায় সোডিয়াম আছে, যেটি ধনাত্মক আয়ন, তাই অক্সাইড আয়নের সঙ্গে সোডিয়াম আয়ন দেখানো যায়। এ ক্ষেত্রে সোডিয়াম আয়নের কাউন্টার বা বিপরীত আয়ন হলো

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

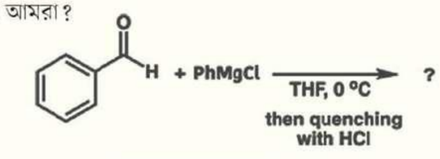
অক্সাইড আয়ন। কিন্তু অক্সাইড আয়ন তো খুব বিক্রিয়াপ্রবণ বা রিঅ্যাকটিভ। যেহেতু এটাও একটা নিউক্লিওফাইল, সেহেতু বিক্রিয়ায় যে অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে, সে অ্যাসিডের প্রোটনকে (হাইড্রোজেন আয়ন) ছিনিয়ে নেবে অক্সাইড। যেটা তৃতীয় অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

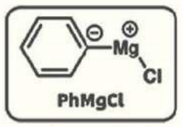
সুতরাং এই বিক্রিয়া থেকে আমরা যে উৎপাদ পাব, সেটা হলো একটা সায়ানোহাইড্রিন যৌগ। রসায়নবিদেরা সময় বাঁচাতে পছন্দ করেন। তাই ওপরের বিক্রিয়ার মেকানিজমকে আরও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু নির্ভুল রেখে নিচের মতো করেও প্রকাশ করা যায়। যদিও চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত মেকানিজম লেখার পারদর্শিতা তৈরি হয়। কিন্তু প্রধান কাজ হলো, মেকানিজম বুঝতে পারা। লজিক প্রয়োগ করে সমাধান করা।



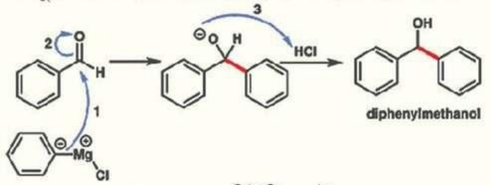
Ph = Phenyl

একই জাতীয় আরেকটা বিক্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করব। নিচের বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে কী যৌগ বা উৎপাদ পাব আমরা?





এখানেও দেখতে পাচ্ছি অ্যালডিহাইড। সুতরাং অ্যালডিহাইড হলো ইলেকট্রোফাইল; সঙ্গে আছে গ্রিগনার্ড বিকারক। কার্বন-ম্যাগনেশিয়ামের যৌগগুলোকে সাধারণভাবে এ নামে ডাকা হয়। বিজ্ঞানী গ্রিগনার্ডের নামে এই নামকরণ করা হয়েছে। কার্বন-ম্যাগনেশিয়ামের বন্ধনকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে বুঝতে বাকি থাকে না যে কার্বন হলো নিউক্লিওফাইল। কারণ, কার্বন ও ম্যাগনেশিয়ামের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য অনেক। ফলে কার্বন আংশিক ঋণাত্মক ও ম্যাগনেশিয়াম আংশিক ধনাত্মক চার্জযুক্ত থাকে। ফলে নিউক্লিওফাইলও আমরা পেয়ে গেলাম।

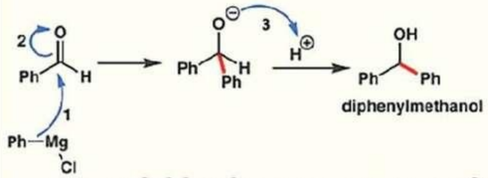


সুতরাং প্রথম ধাপে নিউক্লিওফাইল আঘাত করবে ইলেকট্রোফাইলে। এই বিক্রিয়ায় দুটি বিষয় গুরুত্বসহকারে মনে রাখতে হবে। বিক্রিয়ায় কোন দ্রাবক নির্বাচন করব, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এখানে আমি টিএইচএফ বা টেট্রাহাইড্রোফিউরানের উল্লেখ করেছি। এই দ্রাবক গ্রিগনার্ড বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। দ্রাবকের ওপর বিক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে এবং দ্রাবক নির্বাচন করতে পারা একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। এ বিষয়ে এখানে বিস্তর আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু এ বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে।

আরেকটা বিষয় হলো, এই বিক্রিয়ার শুরুতেই অ্যাসিড যোগ করা যাবে না। প্রথমে অ্যালডিহাইডে ধীরে ধীরে যুক্ত করতে হবে গ্রিগনার্ড বিকারক। তারপর সেই মিশ্রণকে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে নাড়তে হবে। সবশেষে যোগ করতে হবে অ্যাসিডের দ্রবণ। অ্যাসিড দ্রবণের মাধ্যমে বস্তুত এই বিক্রিয়াকে ধ্বংস বা দমন করা হয়।

এই যে সিকোয়েন্স বা ধাপ অনুসারে বিকারক যুক্ত করা, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। অনেক বিক্রিয়ার সফলতা এই ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করা বা মেশানোর ওপর নির্ভর করে। সিকোয়েন্স অনুসরণ না করলে বিক্রিয়া সফল হবে না; অর্থাৎ আমরা যে যৌগ প্রত্যাশা করছি, সেটা পাব না। এই বিক্রিয়ায় তাপমাত্রাও দেখানো হয়েছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝেমধ্যে নিম্ন তাপমাত্রা কিংবা উচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বিক্রিয়া অনেক তাপ উৎপাদন করে। তাই নিম্ন তাপমাত্রায় বিক্রিয়া শুরু করলে সফলতার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সুতরাং ওপরের বিক্রিয়া শেষে আমরা পাব একটি অ্যালকোহল যৌগ। এই যৌগের নাম ডাইফিনাইলমেথানল। মেথানলের দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্তে দুটি ফিনাইল গ্রুপ যুক্ত হলে এই যৌগ পাওয়া যায়। ওপরের বিক্রিয়াকেও রসায়নবিদেরা সময় সাশ্রয় করার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে নিচের মতো করে এঁকেও প্রকাশ করেন।



ওপরে যে দুটি বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সে দুটি বিক্রিয়ায় একটা কমন বিষয় আছে। সেটা হলো, একটা কার্বনিল ইলেকট্রোফাইলে একটা নিউক্লিওফাইল আঘাত করেছে এবং পরে যুক্ত হয়েছে। এ ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় কার্বনিল গ্রুপে নিউক্লিওফিলিক সংযুক্তকরণ বিক্রিয়া বা সংক্ষেপে NAC।

এ ধরনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটা নতুন বন্ধন তৈরি হয়। ওপরের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে কার্বন-কার্বন বন্ধন, যেটা লাল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। রসায়নে কার্বন-কার্বন বন্ধন তৈরির বিক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর রাসায়নিক যৌগ তৈরি করা হয়। এই শ্রেণির (NAC) আরও কয়েকটা উদাহরণ পরের পর্বে আলোচনা করা হবে।

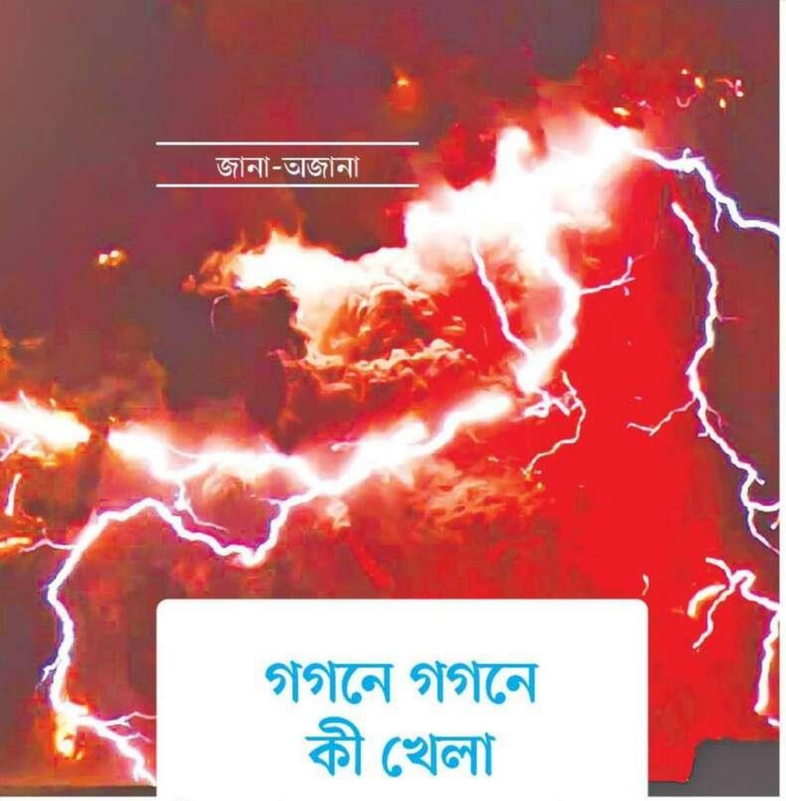
তবে শেষ করার আগে আবারও বলি, যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল বিশ্লেষণের জন্য আমরা শুরুতেই কয়েকটা প্রশ্ন করব। বিক্রিয়ায় ইলেকট্রোফাইল কোনটি? নিউক্লিওফাইল কোনটি? বিক্রিয়াটিতে কি অ্যাসিড আছে? কিংবা ক্ষার বা ক্ষারক? কোন দ্রাবক ব্যবহার করা হচ্ছে? বিক্রিয়াটিতে কি কোনো সিকোয়েন্স বা ধারাবাহিকভাবে বিকারক মেশাতে হবে? এসব প্রশ্নের খণ্ড খণ্ড উত্তর বের করে ক্রিয়াকৌশল আঁকতে হবে এবং বের করতে হবে চূড়ান্ত প্রোডাক্ট বা উৎপাদ। কিংবা ধারণা করতে হবে, বিক্রিয়া শেষে কী উৎপাদ তৈরি হতে পারে?

(চলবে)

লেখক: গবেষক ও লেখক

* আগের পর্ব পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD



গগনে গগনে কী খেলা

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে আকাশে মেঘ জমলেই শোনা যায় মেঘের গর্জন। আর সেই মেঘ আরও ঘনিয়ে এলেই শুরু হয় বজ্রপাত। কিন্তু বজ্রপাতের আগে এই বিদ্যুতের ঝলকানি কীভাবে তৈরি হয়?

বজ্রঝড় বা বজ্রসহ বৃষ্টি হয় সাধারণত বাতাসে আদ্রতা ও তাপমাত্রা বেড়ে গেলে। কারণ, বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে পৃথিবীর অনেক অংশে সূর্যের আলো বেশি পড়ে। ফলে দিনের দৈর্ঘ্য বড় হয় এবং ভূপৃষ্ঠ থাকে উত্তপ্ত। ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হলে সেই তাপ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর ঘনত্ব ঠান্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা হওয়ায় দ্রুত ওপরের দিকে উঠে যায়। আর ঠান্ডা, শুষ্ক বাতাস থাকে নিচে।

বাতাস ওপরে ওঠার সময় এর জলীয় বাষ্প আরও ঠান্ডা হয়ে পানির ফোঁটায় পরিণত হয় এবং তৈরি হয় মেঘ। এই পানির কণাগুলো তাপ ছাড়তে থাকে। ফলে আরও ওপরে উঠতে থাকে মেঘ। মেঘের চারপাশে তখন শক্তিশালী ও ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহ তৈরি হয়।

প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যে এই প্রক্রিয়া থেকে তৈরি হয় বিশাল বজ্রমেঘ। এর নাম 'কিউমুলাস নিমবাস'। এই মেঘ প্রায় ১০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই উচ্চতায় তাপমাত্রা কমতে থাকলেও এর ওপরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ে। ফলে এখানে ঠান্ডা বাতাস এক অদৃশ্য তাপীয় দেয়ালে ধাক্কা খায় এবং মেঘ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আকাশে সেই মেঘ দেখতে লাগে নৌকার মতো।

মেঘের মধ্যে যত বেশি জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়, পানির ফোঁটাগুলো তত বড় হতে থাকে এবং ওপরের ঠান্ডা অংশে বরফকণা তৈরি হয়। এই পানি ও বরফের কণাগুলো যথেষ্ট ভারী হলে বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি হিসেবে নিচে ঝরে পড়ে। ফলে ঠান্ডা বাতাসের একটি দ্রুত প্রবাহ নিচে নামে এবং ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যায় এবং প্রচণ্ড গরম থেকে স্বস্তি দেয়।

একই সময়ে মেঘের ভেতরে ইলেকট্রনের খেলা চলতে থাকে। বায়ুপ্রবাহের কারণে মেঘের অজস্র পানির কণা বরফের কণার সঙ্গে ক্রমাগত ঘষা খায়। এতে পানি ও বরফের কণা থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে বরফের বড় কণাগুলোতে চলে যায়। ফলে মেঘের ওপরের অংশে ভারী ও ঋণাত্মক (-) চার্জযুক্ত ইলেকট্রন জমা হয়, আর নিচের অংশে তৈরি হয় ধনাত্মক (+) চার্জ। অর্থাৎ মেঘের ওপরে ও নিচে বিপরীতধর্মী চার্জ জমা হয়। ফলে তৈরি হয় বিভব পার্থক্য। এই পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণ হলে হঠাৎ করে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে প্রচণ্ড তড়িৎ প্রবাহিত হয়। তড়িৎপ্রবাহ থেকে তৈরি হয় প্রচণ্ড তাপ ও কম্পন। এ সময় বজ্রপাতের শব্দ ও আলো দেখা যায়। এটি হলো ইন্ট্রা-ক্লাউড বজ্রপাত, মানে মেঘের ভেতরেই এর জন্ম ও শেষ।

বজ্রপাতের ধরন

বজ্রপাত একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যার ধরন বিভিন্ন হতে পারে।

বিড বজ্রপাত

এই বজ্রপাত মেঘ থেকে মাটিতে আঘাত করে। এতে বিদ্যুতের ঝলকটি ছোট ছোট, খুব উজ্জ্বল 'পুঁতির' মতো অংশে ভেঙে যায় এবং সাধারণ বজ্রপাতের চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হয়।
ফ্রিকোয়েন্সি : বিরল

রিবন বজ্রপাত

এই বজ্রপাত খুব শক্তিশালী বাতাস ও বারবার বিদ্যুৎ চমকানো ঝড়ের সময় দেখা যায়। এতে বিদ্যুতের প্রতিটি নতুন ঝলক আগেরটির পাশ দিয়ে উড়ে যায়। ফলে মনে হয় যেন আকাশে একটি ফিতার মতো আলোর রেখা তৈরি হয়েছে।
ফ্রিকোয়েন্সি : বেশ বিরল





স্ট্যাকাটো বজ্রপাত

এ ধরনের বজ্রপাত ঘন মেঘ থেকে মাটিতে আঘাত করে। এটি খুব অল্প সময়ের জন্য হয় কিন্তু অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল ঝলকানির সঙ্গে ঘটে।
ফ্রিকোয়েন্সি : সাধারণ

শীট বজ্রপাত

এটা মেঘের ভেতর থেকে হয়। কিন্তু বিদ্যুতের ঝলকটা সরাসরি দেখা যায় না। পরিবর্তে বিদ্যুতের প্রবাহ মেঘের আড়ালে থাকার কারণে চারপাশের মেঘগুলো আলোকিত হয়ে। দেখতে আলোর চাদরের মতো লাগে।
ফ্রিকোয়েন্সি : সাধারণ

মেগাবাইটনিং

এর দেখা পাওয়া যায় ওপরের বায়ুমণ্ডল স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ারে। এটা বড় আকারের বজ্রপাত। স্প্রাইট, ব্লু জেট এবং এলভ—এগুলো সবই মেগাবাইটনিংয়ের অন্তর্ভুক্ত।
ফ্রিকোয়েন্সি : ঘন ঘন

বল বজ্রপাত

এটা অত্যন্ত উজ্জ্বল, গোলাকার বিদ্যুতের ঝলকানি। এর ভিডিও বা ছবি খুব কমই পাওয়া যায়। তবে যাঁরা এটি দেখেছেন, তাঁদের মতে এটি কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকে এবং বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে পারে।
ফ্রিকোয়েন্সি : খুব বিরল



Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বজ্রপাতের আকার, আকৃতি ও গঠন

১. মেঘ থেকে মেঘে বজ্রপাত

বিদ্যুতের চমক মেঘের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যায়। মেঘের ভেতরে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের আলাদা আলাদা অংশের মধ্যে বিদ্যুৎ চলাচল করে।

২. মেঘ থেকে বাতাসে

বজ্রপাত মেঘ থেকে বাতাসেও ছড়িয়ে পড়ে। অনেকটা মেঘ থেকে মেঘে বজ্রপাতের মতোই, পার্থক্য হলো এখানে বিদ্যুৎ মেঘের সবচেয়ে ওপরের ধনাত্মক চার্জযুক্ত অংশ থেকে শুরু হয় এবং আয়নিত চ্যানেল বাতাসের মধ্যে চলে যায়।



৫. মেঘ থেকে মাটিতে বজ্রপাত

মেঘের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের মাঝে বাতাসের মধ্যে বিদ্যুতের একটি রাস্তা তৈরি হলে মেঘ থেকে মাটিতে বজ্রপাত হয়। এই রাস্তা ধরেই বিদ্যুৎ মেঘ থেকে মাটির দিকে নেমে আসে।

৪. মেঘের মধ্যে বজ্রপাত

সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় মেঘের মধ্যে। একটি মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যুতিক চার্জের কারণে এটা ঘটে। বেশিরভাগ বিমান দুর্ঘটনা হয় এই মেঘের মধ্যে বজ্রপাতের কারণে।

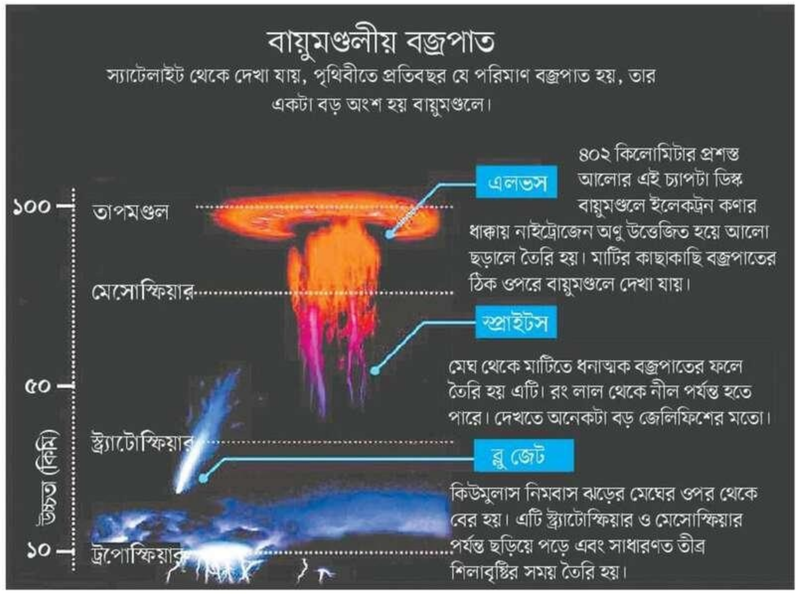
৩. চার্জের পার্থক্য

বজ্রপাত হতে পারে, এমন মেঘে সাধারণত তিন স্তরে বিদ্যুৎ জমা হয়। সবচেয়ে ওপরে থাকে ধনাত্মক চার্জের কেন্দ্র, মাঝের অংশে ঋণাত্মক চার্জ, আর নিচের ছোট অংশে থাকে আরও একটি ধনাত্মক চার্জের এলাকা। মেঘের এই চার্জের ভিন্নতার কারণেই বজ্রপাত তৈরি হয়।

এ ছাড়া মেঘের ঋণাত্মক চার্জ ভূপৃষ্ঠের ইলেকট্রনকে প্রভাবিত করে। ফলে ভূপৃষ্ঠে ধনাত্মক চার্জ তৈরি হয়। এখানেও মেঘ ও মাটির মধ্যে বিপরীত চার্জের কারণে একটি বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই পার্থক্য পর্যাপ্ত হলে মেঘ থেকে মাটিতে তীব্র তড়িৎ প্রবাহিত হয়। একে আমরা বলি বজ্রপাত।

চোখের পলক পড়তেই বজ্রপাত হয়ে যায়। ১০-১০০ মিলিয়ন ভোল্ট বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে এতে। তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৩০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে। লিডার স্ট্রোক সাধারণত ১০ মিলিসেকেন্ডে মাটিতে পৌঁছায়, আর রিটার্ন স্ট্রোক ১০০ মাইক্রোসেকেন্ডে মেঘে ফিরে আসে।

তবে বজ্রপাত শুধু মেঘ থেকে মাটিতেই পড়ে না, ৭৫% বজ্রপাত মেঘ থেকে অন্য মেঘে অথবা একই মেঘের ভেতরে ঘটে। পৃথিবীর ওপরের বায়ুমণ্ডলেও অনেক বজ্রপাত হয়।



গ্রন্থনা : আসহাবিল ইয়ামিন, শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ
সূত্র : হাউ ইট ওয়ার্কস

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

জীবজগৎ

মৌমাছি বনাম বোলতা

এই তো গত মাসের ঘটনা। মৌমাছি গিলে ফেলার পর আকস্মিক মৃত্যু হয় ভারতীয় ধনকুবের সঞ্জয় কাপুরের। এ ঘটনা বেশ তোলপাড় সৃষ্টি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কেননা, তিনি যে বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী। তবে সত্যিই কি মৌমাছি গিলে ফেলার কারণে মৃত্যু হতে পারে মানুষের?

ভারতের হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ নিশান্ত কালরা একটি গণমাধ্যমে বলেন, 'ফরেনসিক রিপোর্ট ছাড়া মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে মৌমাছি গিলে ফেললে একজন মানুষের হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। শ্বাসনালির ওপরের অংশ কিংবা মুখের পেছন দিকটায় মৌমাছির হুল ফুটে যেতে পারে। এভাবে মৌমাছির বিষ মিশে যেতে পারে শরীরে। আর সেই বিষে কারও অ্যালার্জি থাকলে তার রক্তচাপ কমে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ছন্দের পতন ঘটে হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যাও হতে পারে।'

সুতরাং কালো-হলুদ ডোরাকাটা ছোট্ট সুন্দর পতঙ্গটি আসলে ততটাও সুন্দর নয়, বরং ভয়ংকরই বটে। তবে তার চেয়েও ভয়ংকর প্রায় একই রকম দেখতে বোলতা বা বল্লা। জেনে নিন বোলতা আর মৌমাছির পার্থক্য।

মৌমাছি ও বোলতা উভয়ই ফুলের মধু খেতে ভীষণ ভালোবাসে।



মৌমাছি



বোলতা

তথ্যকণা



নাম
মৌমাছি

আবাসস্থল
অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া সব মহাদেশে

আকার
১/২ থেকে ৩/৫ ইঞ্চি (১৩-১৬ মিমি) লম্বা

খাদ্য
'মৌ রুটি', এটি পরাগরেণু ও ফ্রেশ ফুলের মধু মিশিয়ে তৈরি করা হয়



নাম
বোলতা

আবাসস্থল
পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়

আকার
১/২ থেকে ৩/৫ ইঞ্চি (১৩-১৬ মিমি) লম্বা

খাদ্য
মৃত পোকামাকড়, ফল ও মধু



মৌমাছি

দুই দলেরই একটি করে 'রানি' থাকে। বাকিরা মূলত তাদের বাসার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত।

মৌমাছি না বোলতা?

উড়ন্ত অবস্থায় এই ছোট পোকা দুটি আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। এত দ্রুত ভনভন করে উড়ে যায় যে এদের পার্থক্য বোঝাই যায় না। দুটি প্রজাতিই হাজার হাজারের দলে বসবাস করে। দুটিই বিপদের সময় হুল ফোটাতে পারে। আর দুই দলই ফুলের মধু খেতে ভীষণ ভালোবাসে। দুই দলেরই একটি করে 'রানি' থাকে। বাকিরা মূলত তাদের বাসার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত। তাহলে পার্থক্য আসলে কোথায়?

সারা বিশ্বে প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি প্রজাতির মৌমাছি আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে দেখা যায় এপিস সেরানা (*Apis cerana*) এবং এপিস মেলিফেরা (*Apis mellifera*) প্রজাতির মৌমাছি।

এ দুইয়ের পার্থক্য একেবারে কমও নয়। মৌমাছি ও বোলতার প্রধান পার্থক্য হলো এদের ডোরার ধরনে। বোলতার ডোরা স্পষ্টভাবে বিভাজিত থাকে, যেখানে মৌমাছির ডোরার প্যাটার্ন ততটা স্পষ্ট নয়। মৌমাছি অনেক বেশি লোমশ, যাতে পরাগরেণু তাদের গায়ে আটকে থাকে। আর বোলতার চিকন আকৃতির শরীর দেখে সহজেই পার্থক্য করা যায়।



বোলতা

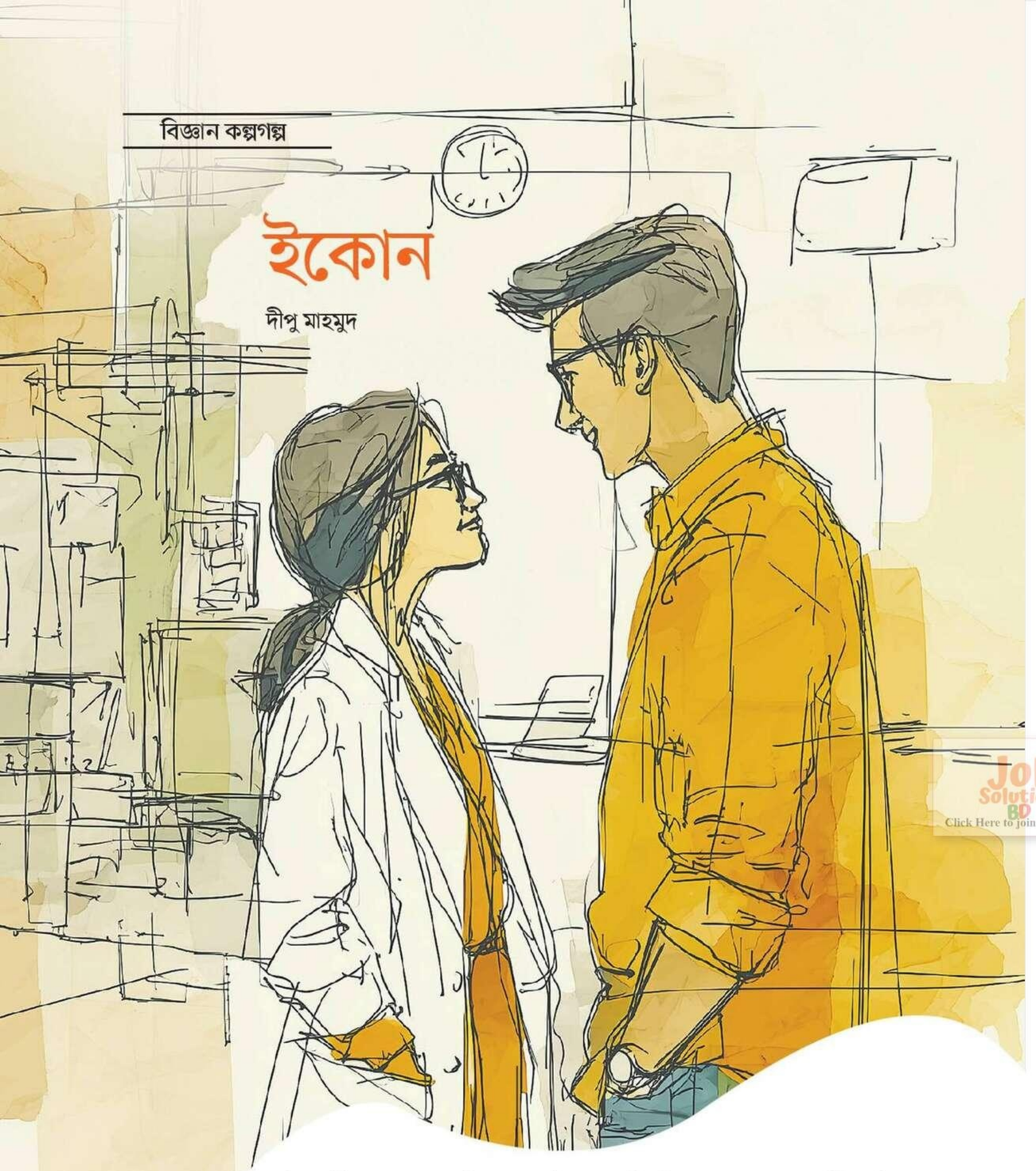
মৌমাছি ও বোলতা—দুই দলই শরীরের উজ্জ্বল হলুদ-কালো রঙে বিপৎসংকেত দেয়। শিকারিদের জানিয়ে দেয় যে এরা হুল ফোটাতে পারে। তবে হুল না থাকলেও আত্মরক্ষায় এই একই কৌশল ব্যবহার করে আরও কিছু পোকা, যেমন হোভারফ্লাই (ফুলের মাছি)। একই রঙের দেখতে হওয়ায় ধোঁকা খেয়ে হলেও তার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হন শিকারিরা। সেটা নিয়ে আলোচনা হবে আরেক দিন।

বিদেশি ম্যাগাজিন অবলম্বনে **রুকাইয়া জহির**



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel



বিজ্ঞান কল্পগল্প

ইকোন

দীপু মাহমুদ

ডক্টর রূপন্তী চোখের কোনায় ভাঁজ পড়েছে। ভাঁজের রেখা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে কানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভাঁজগুলো হয়ে যাচ্ছে আরও গভীর। এমন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হচ্ছে। ডক্টর রূপন্তী একদৃষ্টে তাঁর সামনের মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ সরু হতে হতে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। মনিটরের সবুজ রঙের সরলরেখা কাঁপতে কাঁপতে ঢেউখেলানো দড়ির মতো হয়ে যাচ্ছে। রং বদলে যাচ্ছে সরলরেখার। সবুজ থেকে কমলা হয়েছে। কমলা থেকে লাল হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মনিটরের রেখা লাল হওয়া মানে বিপজ্জনক ঘটনা। যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ঘরের এক পাশে পাঁচজন পাশাপাশি বসে আছেন। পাঁচজন পাঁচ রকমের পেশার সঙ্গে জড়িত। একজন ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা করেন। তাঁর পাশেরজন সবজি বিক্রেতা। তাঁর পাশে বসে আছেন সরকারি কর্মকর্তা। পরেরজন বেকার। সবার ডানে যিনি বসে আছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। এই পাঁচজনকে নিয়ে এসেছে তক্কেল। সে ডক্টর রূপন্তীকে নানা ধরনের মানুষ সাপ্লাই দেয়। তক্কেল সাতজনকে নিয়ে এসেছিল। তাঁদের একজন কলেজের শিক্ষক, আরেকজন রাজনীতিবিদ। বিশেষ বিবেচনায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ডক্টর রূপন্তী পেশায় নিউরোসায়েন্টিস্ট ও ফিজিসিস্ট। তিনি বিশেষ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রের নাম দিয়েছেন 'ইকোন'। ইমোশনাল এনার্জি কনভার্টার। তিনি দেখেছেন, মানুষের আবেগ কখনো বিলীন হয়ে যায় না। এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়।

রেলওয়ে জংশনে ট্রেন থেমেছিল লাইন বদল করবে বলে। ডক্টর রূপন্তী ট্রেনের জানালার পাশে বসে ছিলেন। খোলা জানালা দিয়ে তিনি প্ল্যাটফর্মে নানা রকমের মানুষ দেখছেন। খানিক আগেও যখন ট্রেন এসে স্টেশনে থামে, তখন এসব মানুষের ভেতর প্রচণ্ড ব্যস্ততা ছিল। এখন সবাই অদ্ভুত রিলাক্স মুডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ আয়েশ করে কফি খাচ্ছে। কোনো দুজন গল্প করতে করতে প্ল্যাটফর্মের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

ট্রেনের হুইসেল বাজছে। ইঞ্জিন ঘুরে এসেছে। ট্রেন এখন অন্য লাইনে নেওয়া হবে। তারপর রওনা হয়ে যাবে গন্তব্যে। আচমকা এক লোককে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল। তিনি 'চিনি-মধু' বলে চিৎকার করছেন আর ছুটছেন। ঘটনা তখন জানা গেছে। ভদ্রলোকের দুই যমজ মেয়ে। চিনি আর মধু। তাদের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর। তারা স্টেশনের কল থেকে খাওয়ার পানি আনতে গেছে। এখনো ফেরেনি।

ভদ্রলোক দুই মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয়ে গেছেন। জোরে জোরে ট্রেনের হুইসেল বাজছে। ট্রেন পেছানো শুরু করেছে। পাশের লাইনে গিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে। ভদ্রলোক 'চিনি-মধু' বলে গলা ছেড়ে ডাকছেন আর প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। চিনি আর মধুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ভদ্রলোকের গলা দিয়ে আর কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। তার গলা দিয়ে কান্নার মতো অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।

কয়েকজন মানুষ এগিয়ে গিয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানালেন, যতক্ষণ চিনি আর মধুকে পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ যেন ট্রেন প্ল্যাটফর্ম না ছেড়ে যায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রাজি হয়েছে। তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের এক পাশ থেকে বোতলে পানি ভরে নিয়ে চিনি আর মধু হাসিমুখে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে।

ভদ্রলোক মেয়েদের দেখতে পেয়েছেন। তিনি তাদের দিকে ছুটে গেলেন। ডক্টর রূপন্তী তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। ভদ্রলোকের শোক আচমকা রাগে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তিনি ঠাস ঠাস করে দুই মেয়ের গালে দুটি চড় মারলেন। চড় খেয়ে মেয়ে দুজন হতভম্ব হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারছে না বাবা কেন তাদের মারল। তাদের হতভম্ব ভাব কাটার আগেই বাবা দুই মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। ডক্টর রূপন্তীর মনে হলো, মানুষের আবেগও শক্তির মতো এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হয়।

সেই ভাবনা থেকে ডক্টর রূপন্তী তৈরি করলেন ইমোশনাল এনার্জি কনভার্টার। সংক্ষেপে, ইকোন। আবিষ্কার করলেন আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয়, বিস্ময় কিংবা ঘৃণা—সব আবেগকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কৌশল। দেখালেন হাসির একমুহূর্তের শক্তি দিয়ে একখানা ছোট ঘরকে আলোকিত করা সম্ভব।

যে পাঁচজন ঘরের এক পাশে বসে আছেন, তাঁদের ভেতর পাঁচ রকম আবেগ সঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয় আর ঘৃণা। বিস্ময়ের ব্যাপারটিকে আপাতত সরিয়ে রাখা হয়েছে। ডক্টর রূপন্তী পরীক্ষা করে দেখেছেন, সব আবেগের শক্তি এক রকম নয়। হাসির শক্তি কোমল, স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী। রাগের শক্তি প্রচণ্ড অস্থির এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। দুঃখের শক্তি ধীর, গভীর ও রহস্যময়। আনন্দের শক্তি সৃষ্টিশীল ও হৃদয়স্পর্শী। ভয়ের শক্তি অস্থির ও এলোমেলো। সেখানে ঘৃণার শক্তি কখনো প্রবল, কখনো হালকা। খুব বেশি ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। আবার খানিক বিচ্ছিন্নও। তাই ঘৃণাকে এর সঙ্গে রাখা হয়নি।

সুরক্ষা চেম্বারে ডক্টর রূপন্তীর পাশে এথিন বসে আছে। পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। বয়সে তুখোড় তরুণ। এই আবিষ্কারে প্রথম থেকে সে ডক্টর রূপন্তীকে সহযোগিতা করে আসছে। এথিন ছাড়া অন্য কাউকে এখনো ইকোন আবিষ্কারের ঘটনা জানানো হয়নি।

এথিন অস্থির গলায় বলল, 'ডক্টর, খেয়াল করছেন, মনিটরে একটা রেখা লাল আর মোটা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কেউ অত্যধিক রাগে আক্রান্ত হয়েছে। তার শক্তি হয়ে গেছে অতিরিক্ত।'

ডক্টর রূপন্তী বললেন, 'এটা কার আবেগ?'

এথিন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।'

'তাদের ভেতর আবেগ সঞ্চারের ব্যবস্থা নিশ্চয় পরিকল্পনামতো হয়েছে?'

'প্রত্যেকের ব্রেনের লিম্বিক সিস্টেমের সঙ্গে নির্ধারিত আবেগ সৃষ্টির কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।'

'সেখানে নিশ্চয় নির্দিষ্ট মাত্রায় আবেগ তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'হয়েছিল, কিন্তু রাগের আবেগ সৃষ্টির লিম্বিক সিস্টেমে ছোট সমস্যা দেখা দিয়েছে। লিম্বিক সিস্টেমের সঙ্গে অ্যামিগডালা

সেই বিস্ফোরণে এথিন ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে। পরীক্ষার জন্য যে পাঁচজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের পাওয়া গেছে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়

অংশ আলাদা হয়ে গেছে।'

'কার?'

'সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।'

'তুমি বুঝতে পারছ, এখন কী হতে পারে! অ্যামিগডালা আগ্রাসন তৈরি করে। কারও রাগের আবেগ আগ্রাসী পর্যায়ে চলে গেলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হবে, ধারণা করতে পারছ!'

এথিন কিছু বলল না। মনিটরে লাল দাগ মোটা হয়ে পুরো মনিটর গ্রাস করে ফেলেছে। যেকোনো সময় ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। এখান থেকে এত দ্রুত সেটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এথিন সুরক্ষা চেম্বার থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। রাগের আবেগ তৈরির চ্যানেল বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এথিন এগিয়ে যেতে পারল না। তার আগেই বিস্ফোরণ ঘটল। সেই বিস্ফোরণে এথিন ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে। পরীক্ষার জন্য যে পাঁচজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের পাওয়া গেছে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। ডক্টর রূপন্তী বিশেষ সুরক্ষা চেম্বারে থাকায় রক্ষা পেয়েছেন।

২.

এথিনের সামনে শরবতভর্তি গ্লাস। কমলালেবুর শরবত। তার বিশেষ পছন্দের। শরবত খেতে ইচ্ছা করছে না। কয়েক দিন ধরে এক গভীর চিন্তা তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। ডক্টর রূপন্তীর ল্যাবরেটরিতে দুর্ঘটনার পর এক বছর সে কোনো কাজ করতে

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

পারেনি। বিস্ফোরণে তার ডান পাশ পুড়ে গেছে। পরে কৃত্রিম ডান হাত আর ডান পা লাগানো হয়েছে।

ডক্টর রূপন্তী এর ভেতর তার বানানো ইকোন মেশিন দিয়ে মানুষের আবেগ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছেন। বিজ্ঞান একাডেমি ও সরকার দেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে ডক্টর রূপন্তীর বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে অনুমোদন দিয়েছে। বিজ্ঞান একাডেমি ও সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে দেশে এখন বাণিজ্যিকভাবে মানুষের আবেগ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এথিন সুস্থ হওয়ার পর অনুমোদন নিয়ে নিজেই আবেগের বিদ্যুৎকেন্দ্র বানিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে। তার সামনে যে লোকটি বসে আছে, তার নাম ক্রিসি। সে আবেগ বিক্রি করতে এসেছে। কিন্তু গত সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টা করেও তার ভেতর কোনো আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

এথিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আবেগ বিক্রি করতে চাইছেন কেন?'

ক্রিসি বলল, 'গত ১৫ দিন কোনো কাজ পাইনি। এখান থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে এক অ্যাগ্রো খামারে কাজ করতাম। সেখানে কাজের জন্য নতুন রোবট নিয়ে এসেছে। আমরা ৪৫ জন একসঙ্গে কাজ হারিয়েছি। জমানো যে টাকা ছিল, তাই দিয়ে ২৫ দিন আমাদের খাবার জোটাতে পেরেছি। তার পর থেকে আমরা পরিবারের সবাই আবেগ বিক্রি করে ইউনিট দিয়ে খাবার কিনে খাচ্ছি।'



আমাদের পরিবারের কারও ভেতরে আর কোনো আবেগ নেই। আমাদের সব আবেগ বিক্রি হয়ে গেছে। আমার আবেগ, আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী—সবার।

এথিন বলল, 'কিন্তু আপনার ভেতর তো কোনো আবেগ অবশিষ্ট নেই! কৃত্রিমভাবে কোনো আবেগ তৈরিও করা যাচ্ছে না।'

ক্রিসি প্রায় কেঁদে ফেলেছে। বুজে আসা গলায় বলল, 'আমাদের পরিবারের কারও আর কোনো আবেগ নেই। আমাদের সব আবেগ বিক্রি হয়ে গেছে। আমার আবেগ, আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী—সবার। কোনোভাবে কারও ভেতর আবেগ তৈরি হচ্ছে না। আপনি আরেকবার চেষ্টা করে দেখুন। তা না হলে না খেয়ে মারা যেতে হবে।'

এথিন বলল, 'তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আপনি একইভাবে চেষ্টা করে দেখতে বলে যাচ্ছেন। আমরাও চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনার ভেতর রাগ বা ঘৃণার আবেগও সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। কী করব বলুন!'

হতাশ গলায় ক্রিসি বলল, 'আমার মন মরে গেছে।'

স্থির দৃষ্টিতে এথিন তাকিয়ে আছে। ভেঙে পড়া শরীর ও মন নিয়ে ক্রিসি উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ঘুরে ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এথিনের মনে হলো, মানুষ যখন তার আবেগ বিক্রি করে দেয়, তখন কি সে শুধু তার আবেগ হারায়, নাকি অনুভূতিও হারিয়ে ফেলে!

মনের ভেতর দোটানা ভাব স্থায়ী হতে দিল না। এথিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মানুষের শরীরের রক্তপ্রবাহ ও মস্তিষ্কের তরঙ্গপ্রবাহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে এক অদৃশ্য শক্তি বের হয়। সেটা মানুষের আবেগ। সেই আবেগ কেবল মানসিক নয়, বিশুদ্ধ শক্তি। এটা সম্পূর্ণ জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এখানে অনুভূতির কোনো ব্যাপার নেই।

ঘরের দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে ক্রিসি মিলিয়ে গেল। এথিনের মনে হলো, আবেগকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিকই, তবে সেই সঙ্গে মানুষ তার অনুভূতির গভীরতা হারিয়ে ফেলছে।

৩.

আবহাওয়ার অবস্থা হয়ে আছে এলোমেলো। কিছুক্ষণ আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবহাওয়া শীতল হওয়ার কথা। কিন্তু হয়ে আছে গরম। মনে হচ্ছে, মাটি দিয়ে ভাপ উঠছে। তক্কেল বিরক্ত হয়ে বাইরে থেকে কারখানার ভেতরে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

তক্কেল একখানা বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা বানিয়েছে। সেখানে আবেগ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ বানানোর ব্যবসা করে। তবে তার কারখানা বিজ্ঞান একাডেমি বা সরকারের কাছ থেকে আবেগ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুমতি পায়নি। তাকে ব্যবসা করতে হয় গোপনে। তক্কেলের বেশ কয়জন ভাড়াটে দালাল আছে। তারা কমিশনের বিনিময়ে লোক ধরে আনে, যারা কম মূল্যে তাদের আবেগ বিক্রি করতে চায়। এখানে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তক্কেল সেই বিদ্যুৎ গোপনে চোরাই পথে ছোট ছোট কারখানায় সাপ্লাই দেয়।

তক্কেলের পেছন পেছন ক্রিসি ঢুকেছে। তার মুখ হয়ে আছে বিষণ্ন। পথে এক লোক তাকে এখানকার সন্ধান দিয়েছে। বলেছে, 'তক্কেল মরা মানুষের ভেতর আবেগ সঞ্চার করতে পারে।'

সেই লোকের কথা শুনে ক্রিসি অনেক আশা নিয়ে তক্কেলের কাছে এসেছে। তক্কেল তার কারখানায় আবেগ সৃষ্টির নানা রকম আয়োজন করে রেখেছে। এখানে আবেগময় মুভি, জনপ্রিয় হাসির শো, রোমান্টিক গান—সবকিছুর ব্যবস্থা করা আছে। তা ছাড়া কিছু মানুষ রাখা হয়েছে, যারা তাদের বিরক্তিকর আচরণ দিয়ে কাউকে রাগিয়ে দিতে পারে। তবে এখানে রাগের অতিরিক্ত শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যায়।

গত পরশু একজন এসেছিল আবেগ বিক্রি করতে। মুভি দেখে, গান শুনে কোনোভাবেই তার আবেগ সৃষ্টি করা গেল না। তখন তক্কেল ডাক দিল, 'কিকো!'

ডাক শুনে কিম্ভূতদর্শন এক লোক এগিয়ে এল। তার মুখে বসন্তের দাগ। মোটা দুই ঠোঁট। চোখ দুটো কুতকুতে। থ্যাবড়া নাক। সে জানে, তাকে কেন ডাকা হয়েছে। সে এসে সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে বলল, 'ঘরে ঢুকেই চুরি করেছিস! আবেগ বিক্রি করতে এসেছিস, আবেগ বেচে ইউনিট নিয়ে চলে যাবি। চোর-ছ্যাঁচড়দের মতো ঘরে ঢুকেই জিনিস হাতিয়ে নিলি কেন?'

অমনি সেই মানুষ রেগে গেল। তার মাথায় আর বুকে নানা রকমের পোর্ট আটকানো। কিছুক্ষণ আগে তার ভেতর আবেগ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। আবেগ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবে। তুইতোকারি করবে না। দায়ে পড়ে আবেগ বিক্রি করতে এসেছি। চুরি করতে আসিনি।'

কিকো বলল, 'তোর কাপড় খুললেই বের হয়ে যাবে চুরি করতে এসেছিস, নাকি আবেগ বিক্রি করতে। তুই চোর, তোর বাপ চোর, তোর মা চোর। তোর গোষ্ঠীর সবাই চোর।'

তখনই মানুষটি কিকোর দিকে তেড়ে এল। কয়েক পা এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। যেন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তক্কেল সামনে এসে বলল, 'মেশিন অফ করে দিয়েছি। তোমার রাগের আবেগ থেকে অতিরিক্ত শক্তি তৈরি হয়েছে। তাতে যতটুকু বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে, তাই বিক্রি করে তুমি এক সপ্তাহ ভালোভাবে চলতে পারবে।'

পায়ের আওয়াজ শুনে তক্কেল পেছনে তাকিয়েছে। দেখে, শুকনা মুখে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তক্কেল চোখ দিয়ে ইশারা করে বসতে বলল। নিজে সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল। শান্ত গলায় বলল, 'তোমার নাম কী?'

ক্রিসি বসতে বসতে নিজের নাম বলল।

তক্কেল জিজ্ঞেস করল, 'আবেগ বেচবে? সরকারি কারখানায় গিয়েছিলে?'

ক্রিসি বলল, 'গিয়েছিলাম। তারা আমার ভেতর আবেগ খুঁজে বের করতে পারেনি। শুনেছি, আপনি মরা মানুষের ভেতর আবেগের সন্ধান করতে পারেন। আজ আবেগ বিক্রি করতে না পারলে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে মারা যাব।'

অত্যন্ত গভীর আবেগপ্রবণ গলায় তক্কেল বলল, 'শুধু মানুষের আবেগ নয়, গরুর চোখে পানি দেখেছ? প্রাণীর আবেগ নিয়েও কাজ করছি। বানর, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, কাক সবার আবেগ থেকেই শক্তি নিয়ে বিদ্যুৎ বানাব।'

মাথা নিচু করে বসে আছে ক্রিসি। তার পানির পিপাসা পেয়েছে কি না, বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে, কী যেন দরকার। কী দরকার, আন্দাজ করতে পারছে না।

তক্কেল উঠে ক্রিসির মাথায় আর বুকের কাছে কতগুলো পোর্ট আটকে দিল। ইসিজি বা ইইজি মানে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম করার সময় এ ধরনের পোর্ট লাগানো হয়। তবে এখানে কোনো কেবল ব্যবহার করা হয় না। ওয়্যারলেস।

ক্রিসি কিছু বলল না। সে চুপচাপ বসে থাকল। তক্কেল উঁচু গলায় ডাকল, 'জিন্টু!'

এক লোক ঘরে ঢুকেছে। ক্রিসি মুখ তুলে তাকাল। যে ঘরে ঢুকছে, তাকে ক্রিসি চেনে। এই লোক তাকে তক্কেলের কারখানার খবর দিয়েছে। জিন্টু ঘরে ঢুকে ক্রিসির কাঁধে আলতোভাবে হাত রাখল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'বাড়িতে চলুন।'

জিন্টুর গলায় কিছু ছিল। ক্রিসি অস্থিরতা বোধ করছে। সে বলল, 'কী হয়েছে?'

জিন্টু বলল, 'আপনার কাছ থেকে সব শুনে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনার স্ত্রী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দুই সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে।'

ক্রিসির মস্তিষ্কে অদ্ভুত মিশ্র আবেগ তৈরি হয়েছে। রাগ, দুঃখ ও ঘৃণা একসঙ্গে। আবেগ বাড়ছে। বিপৎসীমা অতিক্রম করার আগেই তক্কেল মেশিন বন্ধ করে দিল। প্রসন্ন হাসি দিয়ে বলল, 'তোমার বউ-ছেলেমেয়ের কিছু হয়নি। তোমার আবেগ পাওয়া গেছে। তার জন্য বেশ ভালো ইউনিট দিচ্ছি তোমাকে। বাড়িতে গিয়ে কয়েক দিন আরাম করে খাওয়াদাওয়া করো। আর প্রয়োজন হলে আমার কাছে চলে আসবে।'

জিন্টুর দিকে তাকিয়েছে ক্রিসি। জিন্টুর মুখ হাসি হাসি।

৪.

গম্ভীর মুখে এথিন বলল, 'ডক্টর রূপন্তী, আমি কনফেস করতে এসেছি। আশা করছি, আপনি আমাকে বুঝবেন।'

ডক্টর রূপন্তী নরম চোখে এথিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ছেলেকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। সে তাকে ছেড়ে গেলেও তার প্রতি ভালোবাসা একটুও কমেনি।

এথিন বলল, 'প্রতিদিন দেশে কয়েক হাজার মানুষের আবেগ থেকে শক্তি সংগ্রহ করা হচ্ছে। মনোযোগ দিলে দেখবেন, এখন আর কারও আবেগ তার নিজের আবেগ নয়। তার হাসি, রাগ, প্রেম সব কৃত্রিমভাবে বানিয়ে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে। তাতে মানুষের ভেতর তৈরি হয়েছে একাকিত্ব ও শূন্যতা। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা কমে এসেছে। স্পন্দন ধীর হয়ে গেছে। মানুষ একা হয়ে গেছে। হাহাকারের মতো একা।'

ডক্টর রূপন্তী বললেন, 'কী চাও তুমি?'

এথিন বলল, 'মানুষ তার সত্যিকারের আবেগ ফিরে পাক।'

ডক্টর রূপন্তী বললেন, 'তোমাকে ভালোবাসি, এথিন। কথা দিচ্ছি মানুষকে তার ভালোবাসা আর সাহসের মতো পবিত্র আবেগ ফিরিয়ে দিতে কাজ করব। তুমি আমার সঙ্গে থেকো।'

এথিন তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ডক্টর রূপন্তীর হাত ধরে সে বলল, 'আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

ডক্টর রূপন্তী ও এথিন দুজনই বুঝতে পারছে, তাদের ভেতর আবেগ তৈরি হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে আবেগের সেই শক্তি বিদ্যুৎ বানিয়ে ঘর উজ্জ্বল করার জন্য নয়, নিজেদের মনকে আলোকিত করার জন্য।

শেষ হলো ৪৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ

নানান আয়োজন এবং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। গত ১৮-২০ জুন, রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবনে আয়োজিত হয় তিন দিনের এ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের ৬৪ জেলা থেকে বিজয়ী ৭০০ প্রতিযোগী এই তিন দিনে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শনী, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান নাটিকা এবং সায়েন্স শোতে অংশ নেয়। বিজ্ঞান কমপ্লেক্স ভবনের দুইতলা জুড়ে জুনিয়র ও সিনিয়র ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীরা মোট ১৮০টি স্টলে নিজেদের প্রজেক্ট প্রদর্শন করে। প্রকল্প প্রদর্শনীতে সিনিয়র, জুনিয়র ও বিশেষ গ্রুপে মোট ২৪ জন, বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতায় ৯ জন এবং বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় ১০ জন শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়।



Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

শুরু হচ্ছে অ্যাপেক্স অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াড

বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে অ্যাপেক্স অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াড ২০২৫। ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার রাজধানীর আফতাব নগরের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আয়োজিত সাংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়। এ অলিম্পিয়াডে ১৪-১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা মোট দুটি ক্যাটাগরিতে অংশ নিতে পারবে। জুনিয়র গ্রুপে ১৪-১৫ বছর বয়সীরা এবং সিনিয়র গ্রুপে ১৬-১৮ বছর বয়সীরা অংশ নেবে। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে ১১-২১ জুলাই দেশের ১০টি অঞ্চলে। সেখান থেকে বাছাই করা হবে ৩০০ শিক্ষার্থী। তারাই অংশ নেবে জাতীয় পর্বে। এরপর ক্লোজড ক্যাম্পের মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে চূড়ান্ত ৫ প্রতিযোগীকে। এই চূড়ান্ত প্রতিযোগীরা আগামী ২০-২৭ সেপ্টেম্বর রাশিয়ায় ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। পাশাপাশি ২৯তম আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড ও এশিয়ান-প্যাসিফিক অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডেও অংশ নেবে।

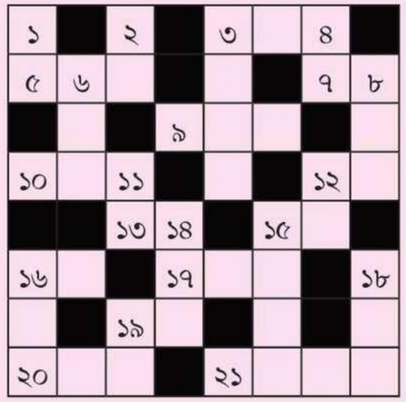


শেষ হলো বুয়েটের আয়োজন ইলেকট্রেজ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২৪তম ব্যাচের নবাগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে আয়োজিত হলো 'ইলেকট্রেজ'। গত ১৯ জুন, বৃহস্পতিবার ইইই-এর ২৩ ব্যাচের আয়োজনে শেষ হয় মাসব্যাপী এই নবীনবরণ অনুষ্ঠান। এটি আয়োজিত হয় বুয়েটের সেন্ট্রাল অডিটরিয়ামে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এর আগে মাসজুড়ে আয়োজিত হয় নানা আয়োজন। ব্রেন ব্রলস সেগমেন্টে ক্যালকুলাস রাম্বেল ও কুইজ ওডেসি, ট্যাকটিক্যাল প্লে অব সেগমেন্টে ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস এবং দাবা প্রতিযোগিতা। গেমারস গানলেট সেগমেন্টে ইএ স্পোর্টস এফসি, ভ্যালোরেন্ট, ই-ফুটবল ও ক্লাস রয়েলের মতো জনপ্রিয় গেমের প্রতিযোগিতা ছিল। এ আয়োজনের শুরু হয়েছিল ২৩ এপ্রিল।



শব্দজট ৫



বাঁ থেকে ডানে

৩. জলজ পরিবেশের এককোষী বা বহুকোষী উদ্ভিদ। ৫. মলাস্কা পর্বের প্রাণী। ৭. একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অপর একটি বৃহত্তম সংখ্যার মধ্যে কতবার আছে, তা নির্ণয় করা। ৯. যে সংখ্যাকে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না। ১০. একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত পদার্থ। ১২. বর্ষজীবী একবীজপত্রী উদ্ভিদ। ১৩. একধরনের কীটজ পণ্য, যার প্লাস্টিকের মতো ধর্ম আছে। ১৫. কাঁধ বা ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ। ১৬. অ্যানাব্যান্টিডি পরিবারের অন্তর্গত স্বাদুপানির মাছ। ১৭. যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ করা যায়। ১৯. কর্ভিডি গোত্রের অন্তর্গত একজাতীয় পাখি। ২০. একটি মৌলিক উপাদান, যা নির্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি একটি পদার্থ। ২১. কোনো প্রাকৃতিক পাথর বা শিলা, যার মধ্যে মূল্যবান খনিজ পদার্থ থাকে।

ওপর থেকে নিচে

১. একধরনের ছোট মাছি প্রজাতির পতঙ্গ। ২. এমন এক ছোট প্রাণী, যারা প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত চুষে খায়। ৩. লাল বোঁটাযুক্ত ছোট সুগন্ধি সাদা ফুল বা তার গাছ। ৪. কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত গলিত পাথর। ৬. গৃহপালিত পাখিদের মধ্যে অন্যতম একটি। ৮. একধরনের অনুভূতি বা অবস্থা, যা উচ্চ তাপমাত্রা বা উষ্ণতার কারণে সৃষ্টি হয়। ১১. একই উৎস থেকে উৎপন্ন এবং একই ধরনের কাজ করা কোষের সমষ্টি। ১২. কতগুলো সংখ্যার সমষ্টিকে সেই সংখ্যাগুলোর মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়। ১৪. যেসব যৌগ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোক্সিল আয়ন প্রদান করে। ১৫. শূন্যের চেয়ে বড় সংখ্যা। ১৬. ক্ষুদ্র অংশ, কণা। ১৮. একটি পদার্থ যা অন্য একটি পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে। ১৯. শ্রবণেন্দ্রিয়।

শব্দজট ৪-এর বিজয়ী দেখুন ৭৭ পৃষ্ঠায়

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'শব্দজট ৫', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'শব্দজট ৫', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে দুজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার!

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

শব্দজটটি তৈরি করেছেন **সুমন মাহমুদ**

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

বুদ্ধির ব্যায়াম

১. আরহাম, আবিদ ও আসিফ তিন বন্ধু। তারা ১ দশমিক ২ কিলোমিটার দূরের নদীর পাশের এক খোলা মাঠে যাবে। সেখানে টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করবে। তাদের সঙ্গে দুটি মাঝারি আকারের টেলিস্কোপ আছে। সেগুলো নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে। সবাই একসঙ্গেই হেঁটে যাবে। কিন্তু তারা চায়, প্রত্যেকে যেন সমান দূরত্ব পর্যন্ত টেলিস্কোপগুলো বহন করে। এই হিসাব অনুযায়ী মোট কতবার টেলিস্কোপগুলো হাতবদল করতে হবে এবং কত মিটার দূরে গিয়ে হাতবদল করবে?



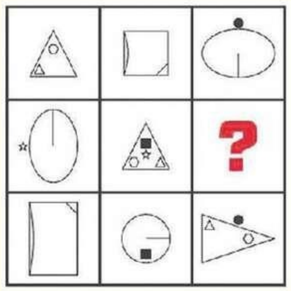
২. নিচে একটা গাণিতিক ধারা আছে। এই ধারার পরের সংখ্যাটি কত হবে?
১, ২, ৪, ৭, ১১, ১৬...?



৩. ডালিয়া ও রিমঝিম এক বন্ধুর জন্মদিনের উৎসবে গেছে। সেখানে তারা কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা গাণিতিক ধাঁধা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। নিচে সমীকরণটা দেওয়া আছে। এটার শুধু উত্তর দিলেই হবে না; বরং সহজ উপায়ে সমাধান করার পদ্ধতিও খুঁজে বের করতে হবে। এই সমীকরণের সমাধান করার জন্য দুটি সহজ উপায় আছে। দেখো তো, তুমি অন্তত একটা পদ্ধতি বের করতে পারো কি না।
(২৩৭ + ৭১১ + ১১৮৫ - ৯৪৮) × ২ = ?



৪. ডালিয়া ওর বন্ধুদের জন্য আরও একটা গাণিতিক ধাঁধা তৈরি করেছে। নিচের ছকে অনেকগুলো জ্যামিতিক আকার আছে। এখন বলো তো, প্রশ্নবোধক চিহ্নের জায়গায় নিচের কোন জ্যামিতিক আকারটা বসবে?



গত সংখ্যার উত্তর

১.



২.
পৃথিবীর অর্ধেক মানে এলিয়েনদের দুই-তৃতীয়াংশ। তাহলে ১২-এর দুই-তৃতীয়াংশ মানে (১২ ÷ ৩) × ২ = ৮। সেক্ষেত্রে ৩৬ মানে (৩৬ ÷ ৩) × ২ = ২৪।

৩.
1 বা 4 বানাতে হবে।

৪.
পিৎজার পরিধি নির্ণয় করলেই মান পাওয়া যাবে। বৃত্তের পরিধির সূত্র হলো : πd। বড় পিৎজার পরিধি ৫০ × ৩.১৪১৬ = ১৫৭.১ সেন্টিমিটার। মাঝারি পিৎজার পরিধি ২ × ৩০ × ৩.১৪১৬ = ১৮৮.৫ সেন্টিমিটার। আর ছোট পিৎজার পরিধি ৩ × ১৫ × ৩.১৪১৬ = ১৪৪.৪ সেন্টিমিটার।

গত সংখ্যার বিজয়ী

স্নেহা তাসনীম
আদর্শ মুসলিম পাড়া, চাঁদপুর
শাহারিয়া মাহমুদ
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
শ্রাবণী আক্তার
তিতাস, কুমিল্লা

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'বুদ্ধির ব্যায়াম', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'বুদ্ধির ব্যায়াম', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

অ্যাপোলো-১১-এর অ্যানাটমি

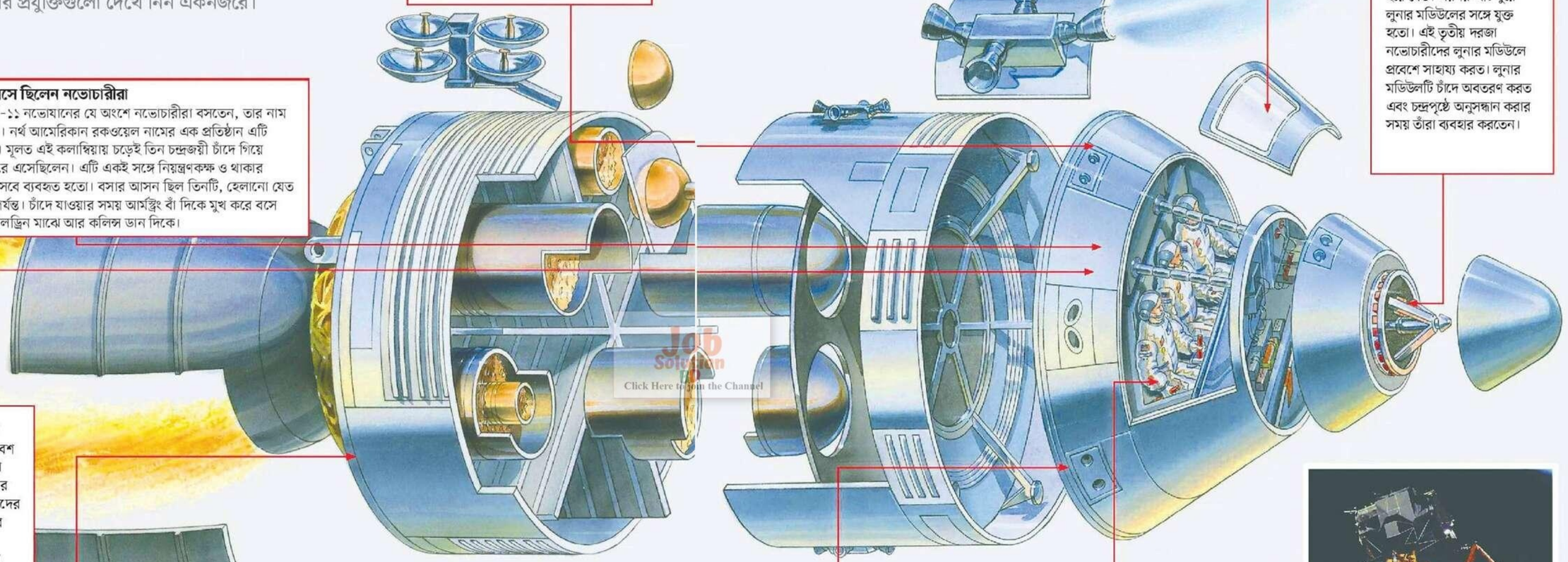
অ্যাপোলো-১১ নভোযানে করে ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই প্রথম চাঁদে পা রাখেন নীল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন। ইগল নামের একটি লুনার ল্যান্ডারে চড়ে চাঁদে নামেন তাঁরা। আর কমান্ড মডিউল কলাম্বিয়ায় চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করেছেন মাইকেল কলিন্স, তিনিই ছিলেন পাইলট। অ্যাপোলো-১১ নভোযানের সেই কলাম্বিয়া মডিউলের চাঁদে যাওয়ার পেছনের প্রযুক্তিগুলো দেখে নিন একনজরে।

তাপরোধক আবরণ
কমান্ড মডিউল পৃথিবীতে ফেরার সময় বাইরের অংশের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৫ হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট। তাই নভোচারীদের বাঁচানোর জন্য 'অ্যাবলেটিভ কোটিং' নামে একধরনের আবরণ দিয়ে তৈরি করা হয় এই শিল্ড। ১৯৬১ সালে নাসার প্রকৌশলীরা এটি তৈরি করেন।

অসাধারণ দৃশ্য
নভোচারীরা পাঁচটি জানালা দিয়ে নক্ষত্র দেখতে পেতেন। দুটি জানালা ছিল সামনের দিকে। আকার ছিল ২০০×৩৩০ মিলিমিটার। শুধু মহাকাশে ডকিং করার সময় ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া সিটের দুই পাশে দুটি ৩৩০ মিলিমিটার বর্গাকার জানালা ছিল। আর প্রবেশ দরজার ভেতরে ছিল ২৭ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলাকার জানালা।

ঢোকা ও বের হওয়া
নভোচারীরা কমান্ড মডিউলে দুই পাশের দরজার যেকোনো একটি দিয়ে প্রবেশ করতেন। তবে ডকিং টানেলের ওপর আরেকটি দরজা লাগানো ছিল। পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়ার পর, কমান্ড মডিউল ও সার্ভিস মডিউল রকেট থেকে আলাদা হয়ে যেত। এরপর এটি ঘুরে লুনার মডিউলের সঙ্গে যুক্ত হতো। এই তৃতীয় দরজা নভোচারীদের লুনার মডিউলে প্রবেশে সাহায্য করত। লুনার মডিউলটি চাঁদে অবতরণ করত এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে অনুসন্ধান করার সময় তাঁরা ব্যবহার করতেন।

যেভাবে বসে ছিলেন নভোচারীরা
অ্যাপোলো-১১ নভোযানের যে অংশে নভোচারীরা বসতেন, তার নাম 'কলাম্বিয়া'। নর্থ আমেরিকান রকওয়েল নামের এক প্রতিষ্ঠান এটি তৈরি করে। মূলত এই কলাম্বিয়ায় চড়েই তিন চন্দ্রজয়ী চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। এটি একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণকক্ষ ও থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বসার আসন ছিল তিনটি, হেলানো যেত ৮৫ ডিগ্রি পর্যন্ত। চাঁদে যাওয়ার সময় আর্মস্ট্রং বাঁ দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। অলড্রিন মাঝে আর কলিন্স ডান দিকে।



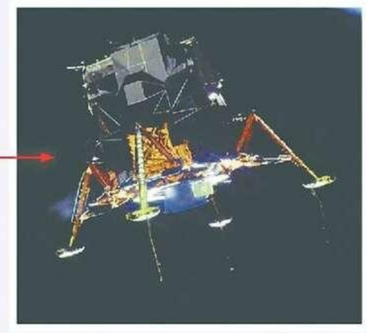
ভেতরে বসার জায়গা
কমান্ড মডিউলটি ছিল বেশ ছোট। ৩.৯ মিটার চওড়া আর ৩.২ মিটার উঁচু। এর ভেতরে বসেই নভোচারীদের প্রায় ৪ লাখ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হয়েছিল। বেশির ভাগ সময়ই তাঁরা বসে ছিলেন। অবশ্য ভেতরে মোট জায়গা ছিল ৩৬৬ ঘনফুট; কিন্তু যন্ত্রপাতি, লকার, নভোচারী ও বসার জায়গা মিলে ব্যবহার করা যেত মাত্র ২১০ ঘনফুট।

সার্ভিস মডিউল
কমান্ড মডিউলের নিচে, যেখানে নভোচারীরা বসতেন, তার ঠিক পেছনের অংশে ছিল জিনিসপত্র রাখার লকার, জ্বালানির ট্যাংক, নভোযানকে ঠিকভাবে চালানোর জন্য ১০টি ছোট ইঞ্জিন, পানির ট্যাংক, বিদ্যুতের তার ও পানির পাইপ। তবে মূল ইঞ্জিনটি ছিল 'সার্ভিস মডিউল'-এ। এই মডিউল সব সময় কমান্ড মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকত। এ দুটি মিলে তৈরি হতো কমান্ড ও সার্ভিস মডিউল।

স্টোরেজ মডিউল—প্রয়োজনীয় সব জিনিস রাখার জায়গা
নভোযানের ভেতরের দেয়ালগুলোয় অনেকগুলো তাক ছিল। সেখানে জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জিনিসপত্র, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, পানি, পোশাক ও খাবার রাখা ছিল। নভোচারীদের প্রথম খাবারে ছিল গরুর মাংস, আলু ও আঙুরের রস। মাইকেল কলিন্স একটি লকারের নিচে মসৃণ দেয়ালে ক্যালেন্ডার এঁকেছিলেন। ১৯৬৯ সালের ১৬ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত তারিখগুলো কেটে রেখেছিলেন। শুধু ২৪ তারিখ, মানে ফেরার দিনটি কাটা ছিল না।

সামনের অংশ
কমান্ড মডিউল তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। নভোচারীদের থাকার জায়গার সঙ্গে একেবারে সামনের অংশে একটি কোণের মতো অংশ ছিল। এটি ছিল চারটি ছোট ভাগে বিভক্ত। অংশটি একটি তাপ নিরোধক আবরণে ঢাকা ছিল এবং এর ভেতরে পৃথিবীতে অবতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যেমন প্যারাস্যুট, সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার জন্য স্লিং, উদ্ধারকারী অ্যানটেনা এবং বিকন লাইট ছিল।

নভোযান চালানোর কৌশল
যেসব নভোচারী কমান্ড মডিউলে ছিলেন, তাঁরা ২.১ মিটার লম্বা ও ০.৯ মিটার চওড়া (মানে ৭ ফুট বাই ৩ ফুট) একটি মূল কন্ট্রোল বোর্ড ব্যবহার করতে পারতেন। এই বোর্ডে অনেক সুইচ ও বোতাম ছিল, যেগুলোর সাহায্যে তাঁরা যোগাযোগ, জ্বালানি, বিদ্যুৎসহ অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। লুনার মডিউলের যে অংশ ফিরে আসার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি অতটা উন্নত ছিল না। তবে এটিরও প্রয়োজনীয় বোর্ড, নিয়ন্ত্রণযন্ত্র আর নিজস্ব জ্বালানি ট্যাংক ছিল।



লুনার মডিউল
কলিন্স যখন কমান্ড মডিউলে ছিলেন, তখন তিন নভোচারীর দুজন—আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন লুনার মডিউলে প্রবেশ করেন। যানটি দুটি ভাগে ভাগ করা ছিল—একটি অংশ চাঁদের মাটিতে নামার জন্য, অন্যটি ওঠার জন্য। চার পা-বিশিষ্ট এই যানটিই চাঁদের মাটিতে নামে। এর পা-গুলো প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারত। নভোচারীরা যান থেকে বের হতে হ্যাচ খুলে মই বেয়ে নিচে নেমে এসেছিলেন। এই যান চালানোর সময় বসে থাকা যেত না। চালাতে হতো দাঁড়িয়ে। আর নভোযানে থাকা অ্যানটেনার মাধ্যমে তাঁরা পৃথিবীর মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

অজ অ্যান্ড্রুজ স্পেস অবজারভেটরি কাজী আকাশ

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

প্রজেক্ট

মজার হবি ইলেকট্রনিকস

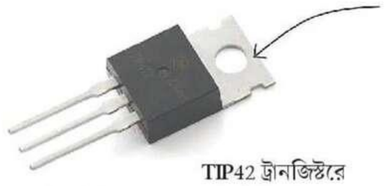
প্রজেক্টের খুঁটিনাটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লেখা হবে বিজ্ঞানচিন্তায়। ধাপে ধাপে শেখানো হবে, কীভাবে প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে। তারপর তুমি নিজেই বানাতে পারবে নানা রকম প্রজেক্ট। এবার আলোচনা করা হলো ট্রানজিস্টর নিয়ে।

ট্রানজিস্টর

বেশির ভাগ ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনাল থাকে—ইমিটার (বৈদ্যুতিক চার্জ বাহক), বেস ও কালেক্টর। যখন বেজের মধ্য দিয়ে অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন এটি ইলেকট্রনগুলোকে অ্যামিটার থেকে কালেক্টরে (অথবা কালেক্টর থেকে ইমিটারে) প্রবাহিত হতে দেয়। অনেকটা ট্যাপের মতো। ট্যাপ একটু ঘোরালেই যেমন পানি বের হয়, তেমনি এটা থেকে বের হয় বিদ্যুৎ। ট্রানজিস্টর আবার অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবেও কাজ করতে পারে। একটা ট্রানজিস্টর ছোট একটা সিগন্যালকে বড় করতে পারে। কারণ, ট্রানজিস্টরের বেজ দিয়ে খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ দিলেও সেটা অনেক বেশি পরিমাণের বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা আবার ইমিটার ও কালেক্টরের মধ্য দিয়ে যায়। মানে অল্প বিদ্যুৎ যেমন ওঠানামা করে, বেশি বিদ্যুৎও ঠিক তেমনই ওঠানামা করে। এভাবে ছোট সিগন্যালকে বড় করা যায়।



TIP31 ট্রানজিস্টরে ইমিটার থেকে কালেক্টরে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়।



TIP31 NPN ট্রানজিস্টর

TIP42 ট্রানজিস্টরে কালেক্টর থেকে ইমিটারে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়।

TIP42 PNP ট্রানজিস্টর

স্পিকার ও ইয়ারফোন

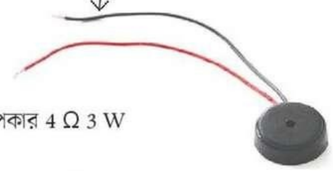
স্পিকারে বিভিন্ন পরিমাণে বিদ্যুৎ গেলে এটি কাঁপে। এই কম্পন বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দতরঙ্গ হিসেবে ছড়িয়ে পড়লে তা আমরা শুনতে পাই। ইয়ারফোনের মধ্যে খুব ছোট স্পিকার থাকে। কিছু স্পিকারকে পিয়েজো সাউন্ডার বলে। এগুলো শুধু একটা সুরের মতো সাধারণ শব্দ করতে পারে।

স্পিকারগুলো কত ওয়াট (W) পাওয়ার উৎপাদন করতে পারে, তার ভিত্তিতে রেটিং দেওয়া হয়।

পিয়েজো সাউন্ডার একক সুর তৈরি করে।



স্পিকার 4 Ω 3 W



পিয়েজো সাউন্ডার



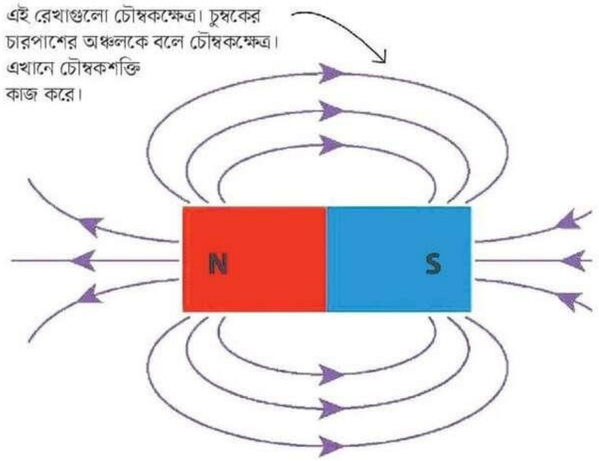
স্পিকার 8 Ω 1 W



চুম্বক

তোমরা নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছ! এগুলোর সব সময় একটি চৌম্বকক্ষেত্র ও একটি 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' মেরু থাকে। ফ্রিজের গায়ে লাগানো থাকে একধরনের চুম্বক। সেগুলোকে বলা হয় স্থায়ী চুম্বক। এ ছাড়া তড়িৎ-চুম্বক আছে। এগুলো তারের মতো কুণ্ডলী আকারে প্যাঁচানো থাকে। কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই এগুলোর চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়। তবে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিলে আর চুম্বকের মতো কাজ করে না।

এই রেখাগুলো চৌম্বকক্ষেত্র। চুম্বকের চারপাশের অঞ্চলকে বলে চৌম্বকক্ষেত্র। এখানে চৌম্বকশক্তি কাজ করে।





ফেরাইট চুম্বক

রেজিস্টর

সার্কিটের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও ভোল্টেজের (বৈদ্যুতিক চাপ) পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয় রেজিস্টর। সহজ কথায়, রেজিস্টর বিদ্যুৎকে তার পছন্দমতো পথে যেতে সাহায্য করে। সার্কিটের নির্দিষ্ট অংশে সঠিক পরিমাণে বিদ্যুৎ ও ভোল্টেজ পৌঁছাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করে রেজিস্টর নামের ছোট্ট যন্ত্রটি। একটি ক্যাপাসিটর কতটা দ্রুত চার্জ হবে, তা-ও নিয়ন্ত্রণ করে এই যন্ত্র। ক্যাপাসিটর মানে বিদ্যুৎ জমা রাখার যন্ত্র। রেজিস্টরের মান ওহম (Ω) এককে মাপা হয়। এক হাজার ওহমকে বলা হয় এক কিলোওহম (kΩ)। আর ১০ লাখ ওহমকে বলে এক মেগাওহম (MΩ)।



৩৯০ Ω রেজিস্টর

রঙিন ব্যান্ডগুলো রেজিস্টরের মান ওহমে প্রকাশ করে।

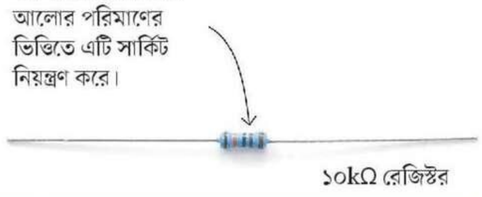


১০০Ω রেজিস্টর



১kΩ রেজিস্টর

ফটোরেজিস্টর বিশেষ একধরনের রেজিস্টর। আলোর পরিমাণের ভিত্তিতে এটি সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করে।



১০kΩ রেজিস্টর

কিছু রেজিস্টরে পাঁচটি ব্যান্ড থাকে, আবার চারটিও দেখা যায়।



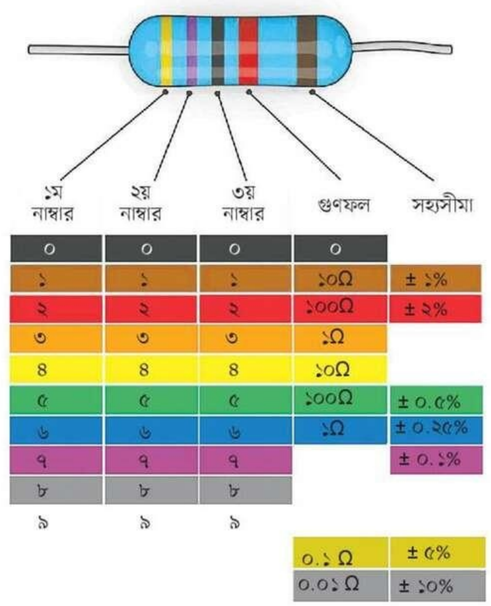
ফটোরেজিস্টর

জানা-অজানা

- বিদ্যুতের ট্রাফিক পুলিশ বলা যেতে পারে রেজিস্টরকে! এটি সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক যেমন ট্রাফিক পুলিশ রাস্তার গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
- ছোট্ট রেজিস্টরগুলোর গায়ে কিছু রঙিন ব্যান্ড থাকে। এগুলোকে বলে কালার কোড। এগুলো রেজিস্টরের রোধের মান নির্দেশ করে। এটা অনেকটা গোপন ভাষার মতো।
- রেজিস্টর যখন বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাধা দেয়, তখন বিদ্যুতের কিছু শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বেশিরভাগ সময় এই তাপ কমানোর চেষ্টা করে। কারণ, এটা শক্তির অপচয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত তাপের জন্য ব্যবহৃত হয় রেজিস্টর।

রেজিস্টর পড়ার নিয়ম

ডান দিকের চিত্রটি দেখাচ্ছে, কীভাবে রেজিস্টরের চার বা পাঁচটি রঙিন ব্যান্ড দেখে রেজিস্ট্যান্স বা রোধের মান নির্ণয় করতে হয়। প্রথম তিনটি ব্যান্ড হলো সংখ্যা, আর চতুর্থটি গুণক। রেজিস্টরের একেবারে ডান দিকে আলাদাভাবে রাখা রঙিন ব্যান্ডটি দেখে বোঝা যায়, রেজিস্টরের মান কতটা নির্ভরযোগ্য। এ ক্ষেত্রে রেজিস্টরের ব্যান্ডগুলো হলো হলুদ, বেগুনি ও কালো। এই তিনটি রং মিলে হয় ৪৭০। চতুর্থ ব্যান্ডটি লাল। এর মানে ৪৭০-কে ১০০Ω দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে পাওয়া যাবে ৪৭,০০০Ω। সাধারণত একে ৪৭kΩ লেখা হয়। শেষ ব্যান্ডটি হলো সহনশীলতা। এটি বাদামি রঙের। এর মানে এই রেজিস্টরের আসল মান ৪৭kΩ রিডিংয়ের ১ শতাংশের মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ এর মান ৪৭kΩ থেকে ১ শতাংশ বেশি বা কম হতে পারে।

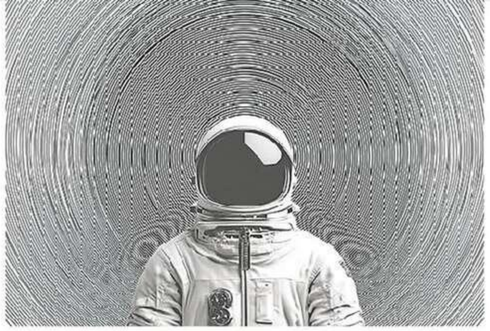


ট্রেস ল্যাব অবলম্বনে কাজী আকাশ

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

কার্যকারণ

আব্দুল কাইয়ুম



মহাবিশ্বের কোনো স্থানে মহাকর্ষ বল ছাড়া সম্পূর্ণ স্থির থাকা কি সম্ভব?

আসলে এই মহাবিশ্বে একেবারে স্থির বলে কিছু নেই। কারণ, আমরা ত্রিমাত্রিক বিশ্বে বাস করি। মহাশূন্যে এমন কোনো স্থানে যদি কেউ অবস্থান করেন, যেখানে মহাকর্ষ বল কাজ করে না, মানে আশপাশে কোনো বিশাল বস্তু নেই; এ অবস্থায় সেখানে তিনি অন্য কোনো দূরবর্তী জিনিসের তুলনায় স্থির থাকবেন বটে, তবে স্থান-কালের ত্রিমাত্রিক পরিমাপে ঠিক স্থির অবস্থানে থাকবেন না। আরেকটি কথা, তিনি মহাশূন্যে ভেসে থাকবেন বটে; কিন্তু কষ্ট হবে। কারণ, আমরা সাধারণত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণে থাকি। সেখানে মহাকর্ষ বল না থাকলে আমাদের অস্থিমজ্জা চরম বিপর্যয়ে পড়বে। হয়তো রক্তনালিগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাতাসের অভাবে মৃত্যু অনিবার্য। তাই মহাশূন্যে অবস্থান করতে হলে অবশ্যই স্পেসস্যুট ব্যবহার করতে হবে।

জুলাই মাসে কেন এত গরম

প্রশ্ন শুনলে সবাই খুব অবাক হবেন। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমকালে গরম হবে না তো কী হবে? প্রশ্নযোগ্য ব্যাপার বটে। শুধু জুলাই কেন, মে থেকেই তো গরম শুরু হয়ে যায়। এটা স্বাভাবিক; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—যখন দেখি, এই জুলাই মাসেই পৃথিবী থেকে সূর্য সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে। জানুয়ারিতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চেয়ে জুলাই মাসে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি। সূর্য দূরে থাকলে তো সূর্যের তাপ কম পাওয়ার কথা। তাহলে বেশি ঠান্ডা না হয়ে কেন সবচেয়ে বেশি গরম এ সময়ে? এবার নড়েচড়ে বসতে হয়। কারণ, আমরা সাধারণত এ হিসাবটা ধরি না। অবশ্য না ধরাটাই স্বাভাবিক। সূর্য দূরে থাকলেও মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর শীত-গরম কিন্তু সূর্যের দূরত্বের কারণে হয় না। এর প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট অংশে সূর্যরশ্মি সরাসরি খাড়াভাবে পড়ছে, নাকি বাঁকাভাবে, তার ওপর। পৃথিবী উল্লম্ব অবস্থান থেকে ২৩ ডিগ্রি কোণে কাত হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে বলে এ রকম হয়। গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি মুখোমুখি অবস্থান করে। আবার শীতকালে উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে বেশি দূরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ফলে জানুয়ারির দিকে বেশি ঠান্ডা পড়ে। আমাদের দেশ উত্তর গোলার্ধে। গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে। বলা যায়, আমাদের মাথার ওপর। এ অবস্থায় সূর্যের আলো সরাসরি—অনেকটা খাড়াভাবে পড়ে। সূর্যরশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের অংশ বেশি ও বেশি ঘনত্বের অংশ কম অতিক্রম করতে হয়। ফলে সূর্য দূরে থাকলেও আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ বেশি তীব্র হয়। তাই গরমও বেশি হয়। সঠিক হিসাব অনুযায়ী ২৩ জুন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ার কথা; কিন্তু সমুদ্রস্রোতের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে অনেক সময় কোনো কোনো দেশে, যেমন ইউরোপের কিছু দেশে জুলাই মাসে বেশি গরম পড়ে।

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

ধাঁধা



ধূর্ত খুনি

একজন লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। মৃত ব্যক্তির এক হাতে টেপরেকর্ডার আর অন্য হাতে একটা বন্দুক। পুলিশ টেপরেকর্ডার চালু করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের কণ্ঠ ভেসে এল। শুনে মনে হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির কথা। সে বলছিল, 'আমার বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই। আর পারছি না আমি।' তারপরই একটা গুলির আওয়াজ হলো। এখানেই শেষ। তবে এতটা শুনেই পুলিশ বুঝতে পারল, এটা আত্মহত্যা নয়, খুন! পুলিশ কীভাবে বুঝল যে এটা আত্মহত্যা নয়?

আদালতে খুনি

এক নারীকে তাঁর স্বামীর খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে নারী বলছেন, তিনি দোষী নন। তাঁর স্বামীকে তিনি এখনো খুব মিস করছেন। এদিকে ওই নারীর পক্ষের উকিল কোনোভাবে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছিলেন না। ফলে তিনি একটা চালাকি করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আসলে ওনার স্বামী মারাই যাননি। তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এক্ষুনি তিনি আদালতে এসে উপস্থিত হবেন। এই বলে উকিল বলে উঠলেন, 'ওনাকে ভেতরে নিয়ে আসুন।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই দরজার দিকে তাকালেন। কিন্তু উকিল আর ওই নারী তাতে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন উকিল বললেন, 'দেখলেন তো! আপনারা যদি নিশ্চিত হতেন যে আমার মক্কেল তাঁর স্বামীকে খুন করেছেন, তাহলে আপনারা দরজার দিকে তাকাতেন না!'

কিন্তু তারপরও বিচারক সঙ্গে সঙ্গে নারীটিকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। বলুন তো, কেন?

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সমাধানদাতা ২ জনের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই। খামের ওপর অবশ্যই 'গোয়েন্দা ধাঁধা' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান

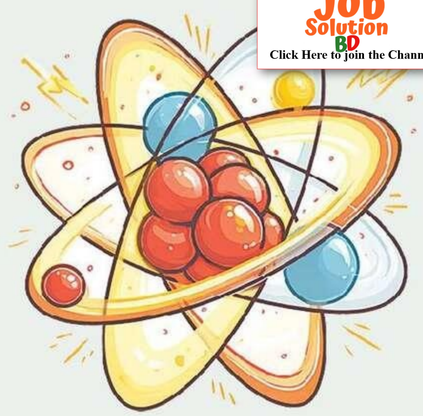
উত্তর দিচ্ছেন সম্পাদক **আব্দুল কাইয়ুম**

প্রশ্ন : চৌম্বকশক্তিকে কি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা যায়?

উত্তর : চৌম্বকশক্তিকে অবশ্যই বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রনগুলো কিছুটা শিথিলভাবে থাকে। তাই কোনো চুম্বকের চারপাশে যদি এ ধরনের ধাতব পদার্থের তারের কুণ্ডলী চক্রাকারে ঘোরানো হয়; অথবা কোনো তারের কুণ্ডলীর চারপাশে একটি চুম্বক ঘোরানো হয়, তাহলে তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যা বিদ্যুৎশক্তি হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। আমাদের দেশে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রে টারবাইন ঘুরিয়ে পানিপ্রবাহের গতিশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা হয়।

পরমাণু কি দেখা সম্ভব?

উত্তর : ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি সাব-অ্যাটমিক কণা খুবই ক্ষুদ্রাকারের। এত ছোট যে এগুলো আলোর



বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে না। সুতরাং এসব কণা সরাসরি দেখা যায় না; কিন্তু পরোক্ষ উপায়ে এগুলো সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন এসব কণা যে বিকিরণ ঘটায়, বিশেষ পদ্ধতিতে তার প্রতিফলন ঘটানো যায়। এভাবে ইলেকট্রন-প্রোটন প্রভৃতির উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। তবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কোনো বস্তুর পাঁচ লাখ গুণ বড় চিত্র দেখা যায়। এর সাহায্যে কোষের ভেতরের প্রসারিত চিত্র দেখা সম্ভব। এভাবে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা ও অ্যাটম দেখা যেতে পারে।

সুডোকু ৫২

সুডোকু বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক ধাঁধা। বুদ্ধির ব্যায়াম করতে, নিউরনের ক্ষমতা বাড়াতে কিংবা সময়কে আনন্দময় করতে এই জাপানি ধাঁধা সহায়ক হতে পারে। প্রতিটি কলাম ও সারিতে ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক মাত্র একবার বসাতে হবে। তেমনি প্রতিটি ৩×৩ বর্গক্ষেত্রের ভেতরেও ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক একবার বসবে। নিচের সুডোকুটি পূরণ করে পুরস্কার জিতে নিন।

সুডোকু ০১

৩					৯			
								৬
		৯		৪	৬	১		৩
	৩			২			৫	
৮			১		৫			৪
	৪			৭			৮	
৫		৬	৭	৮		৪		
৭								
			৬					৫

সুডোকু ০২

৪								৫
		৩					২	৮
			৬	৯			১	
					৬	৯		৩
৩			৯		১			২
২		৯	৫					
	৪			৮	৫			
১	৯					২		
৫								১

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সমাধানদাতা একজন পাবেন ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই। খামের ওপর অবশ্যই 'সুডোকু ৫২' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

গত সংখ্যার গোয়েন্দা ধাঁধার বিজয়ী

রেজোয়ান হোসেন, সুলতানপুর, ফেনী
মালিহা জামান, শিবপুর, নরসিংদী
সাব্বির হোসেন, কালিহাতী, টাঙ্গাইল

শব্দজব্দ ৪-এর বিজয়ী

মেহেদি হাসান, শিবচর, মাদারীপুর
ইফফাত জাহান, কালুখালী, রাজবাড়ী
ইশতিয়াক আহমেদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সুডোকু ৫১-এর বিজয়ী

আহনাফ আবিদ, কায়েতপাড়া, পঞ্চগড়
ফাতেমা আক্তার, হরিনাল রোড, জয়দেবপুর
সামিয়া সুলতানা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

কুইজ

তিন অঙ্কের সংখ্যাটি কত

আব্দুল কাইয়ুম



ছোটবেলায় মাঝেমধ্যে গণিতের সমস্যাগুলোকে মনে হতো খুব কঠিন। আসলে তা নয়। নিয়ম বুঝে চর্চা করলেই মনে হতো সহজ। খুব খুশি লাগত তখন। এ রকম একটি ধাঁধার কথা বলি। তিনটি অসম অঙ্কের সংখ্যাকে উল্টে লিখে প্রাপ্ত সংখ্যা দুটির মধ্যে বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করি। বিয়োগফলের শেষ অঙ্কটি (এককের ঘরের অঙ্কটি) যদি ৭ হয়, বলুন তো বিয়োগফলটি কত ছিল এবং মূল সংখ্যাটি কত?

প্রথমে মনে হয়, এটা খুব কঠিন। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী দুটি সংখ্যা লিখে বড়টি থেকে ছোটটি বিয়োগ করলে সহজে প্রশ্নের সমাধান বের করা যায়। কারণ, যেহেতু তিন অঙ্কের সংখ্যা, তাই একে উল্টে লিখলে মাঝের সংখ্যাটি একই থাকে। এখন বড় সংখ্যা থেকে ছোটটি বিয়োগ করলে বিয়োগফলের মাঝের সংখ্যাটি হবে ৯। বিয়োগফল কিন্তু শূন্য হবে না। এটি হবে তিন অঙ্কের। এর প্রথম (শতকের ঘরের) অঙ্ক ও তৃতীয় (এককের ঘরের) অঙ্কের যোগফল হতে হবে ৯। আমাদের প্রশ্নে যেহেতু শেষ অঙ্কটি ৭, তাই প্রথম অঙ্কটি = (৯ - ৭) = ২। সুতরাং সংখ্যাটি ২৯৭ এবং মূল সংখ্যাটি হবে ৪৯১। একে উল্টিয়ে লিখলে হবে ১৯৪। এদের বিয়োগফল = (৪৯১ - ১৯৪) = ২৯৭। মূল সংখ্যাটি যদি ৪৮১ অথবা ৫৮২ হয়, তাতেও শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত দুটি বিয়োগফল একই হবে—২৯৭। এখন বিয়োগফলের মাঝের অঙ্কটি সব সময় কেন ৯ এবং প্রথম ও তৃতীয় ঘরের অঙ্ক দুটির যোগফলও কেন ৯ হবে, তা একটু চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যায়।

এ মাসের ধাঁধা

পৃথক তিন অঙ্কের এমন একটি বৃহত্তম ধনাত্মক বর্গসংখ্যা বের করো, যার অঙ্কগুলো (ডিজিট) উল্টিয়ে লিখলে আরেকটি তিন অঙ্কের পূর্ণ বর্গসংখ্যা পাওয়া যাবে এবং যা তিন অঙ্কের পূর্ণ বর্গসংখ্যাগুলোর মধ্যে বৃহত্তম?

ধাঁধার উত্তর পাঠিয়ে দাও বিজ্ঞানচিন্তায়।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

পাঁচটি জোড় সংখ্যার যোগফল যদি ৬০ হয়, তাহলে এদের মাঝের সংখ্যাটি কত?

উত্তর

মাঝের সংখ্যাটি ১২

কীভাবে উত্তর বের করলাম

ধরা যাক, জোড় সংখ্যা পাঁচটি (ক-৪), (ক-২), (ক), (ক+২) এবং (ক+৪)। এদের যোগফল = ৫ক = ৬০। সুতরাং ক = ১২। এটাই মাঝের সংখ্যা।

জুন সংখ্যার সঠিক ১০ উত্তরদাতা

প্রণব কুমার, ধামরাই, ঢাকা
মোহাম্মদ আজম, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
সারোয়ার জাহান, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
এনামুল কবির, দোহার, ঢাকা
রওনক জাহান, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
এম আহমেদ, আটপাড়া, টাঙ্গাইল
নাজমা চৌধুরী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা
মাহবুবুল হক, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
শামসুল আলম, আলীকদম, বান্দরবান
আফসানা আক্তার, বরুড়া, কুমিল্লা

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

পাঠক যখন লেখক

হয়তো আপনার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের বিজ্ঞান লেখক। হয়তো আপনি চাইছেনও কিছু একটা লিখতে। তবে দেরি কেন, ৫০০ শব্দের ভেতর লিখে ফেলুন বিজ্ঞান বা গণিতবিষয়ক কোনো ফিচার কিংবা মজার তথ্য। পাঠাতে পারেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের খবরও। তবে যা-ই লিখুন, সেটাতে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং সূত্রটা থাকে ঠিকমতো। তারপর লেখাটা পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার দপ্তরে। মানসম্মত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইন বা প্রিন্ট সংস্করণে। লেখা পাঠাতে পারেন—editor@bigganchinta.com ঠিকানায়। অথবা লেখা অ্যাটাচ করে দিতে পারেন facebook.com/bigganchinta এই পেজের ইনবক্সেও। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।



কুইজ

রসায়ন কুইজ ১০৩

১. পানির তুলনায় নিচের কোনটি ভারী, কিন্তু দেখতে পানির মতোই?
ক. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড
খ. অ্যাসিটোন
গ. ইথানল

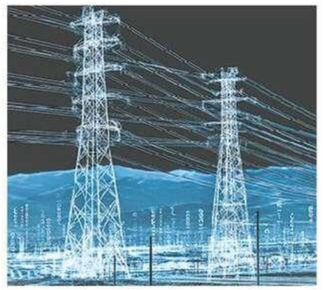


২. কোন ধাতু পানি স্পর্শ করলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়?
ক. সিসা
খ. পটাশিয়াম
গ. দস্তা

৩. আমাদের দেহে সবচেয়ে বেশি থাকে কোন মৌল?
ক. লোহা
খ. ক্যালসিয়াম
গ. অক্সিজেন

রসায়ন কুইজ ১০২
১. খ. গ্যালিয়াম
২. ক. পারদ
৩. খ. সোডিয়াম বাইকার্বোনেট

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০৩



১. কোনটি বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধা দেয়?
ক. তামা
খ. লোহা
গ. কাঠ

২. নিউটনের গতিসূত্র নিচের কোনটি?
ক. বল = ভর × ত্বরণ
খ. বল = বেগ × ত্বরণ
গ. ভর = ওজন × ত্বরণ

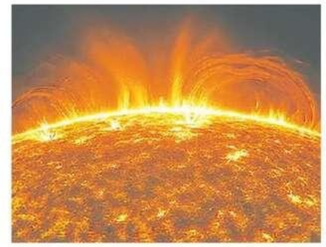
৩. বেলুন ঘষে কাগজের টুকরার কাছে আনলে টুকরাগুলো লাফায় কেন?
ক. বাতাসের টানে
খ. শব্দের জন্য
গ. ঘর্ষণের কারণে

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০২
১. খ. বাষ্পের চাপ
২. গ. কালো
৩. খ. রন্টজেন

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০৩

১. সূর্য কোন ধরনের নক্ষত্র?
ক. লাল দানব
খ. সাদা বামন
গ. হলুদ বামন

২. মহাবিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতির বস্তু কী?
ক. ধ্বনি
খ. আলো
গ. উল্কা

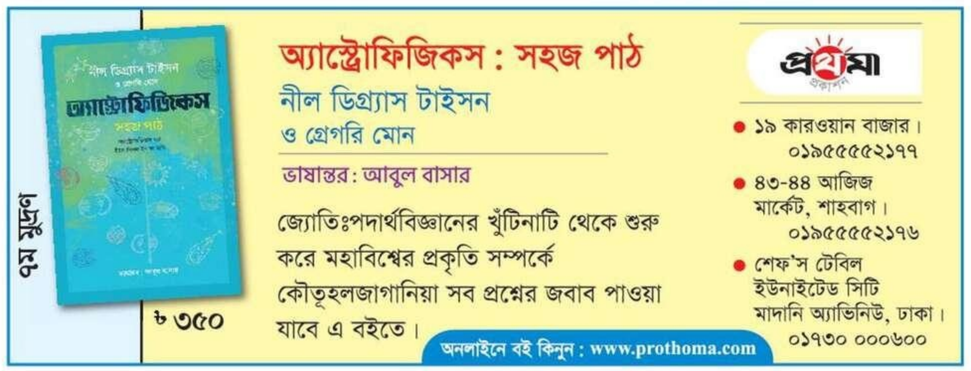


৩. কোন গ্রহে এক দিন সবচেয়ে দীর্ঘ?
ক. পৃথিবী
খ. শুক্র
গ. মঙ্গল

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০২
১. ক. ১/৬
২. ক. ৯০ মিনিট
৩. খ. শুক্র

প্রতিটি কুইজের উত্তর আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। না হলে উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। একই খামে একাধিক কুইজ পাঠানো যাবে। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন রকমারি.com -এর সৌজন্যে ৩০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৫।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

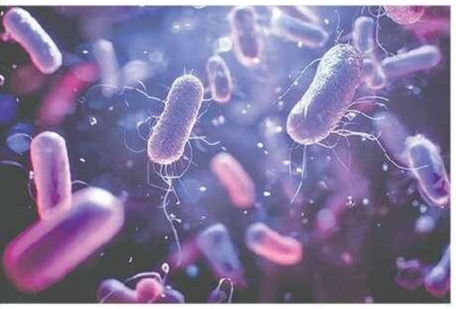


Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০২

১. নিচের কোনটি এককোষী প্রাণী?
ক. হাইড্রা
খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. কেঁচো



২. আমাদের দাঁত কী দিয়ে তৈরি?
ক. হাড়
খ. ত্বক
গ. এনামেল

৩. শরীরের ফিল্টার হিসেবে কাজ করে কোন অঙ্গ?
ক. ফুসফুস
খ. যকৃৎ
গ. কিডনি

প্রযুক্তি কুইজ ৭৫

১. কোনটিকে কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক' বলা হয়?
ক. র‍্যাম
খ. মনিটর
গ. সিপিইউ

২. ইউএসবি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক. ছবি আঁকতে
খ. ডেটা আদান-প্রদানে
গ. গেম খেলতে



৩. নিচের কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়?
ক. উইন্ডোজ
খ. অ্যান্ড্রয়েড
গ. গুগল

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০২-এর উত্তর
১. খ. আইরিস
২. খ. অগ্ন্যাশয়
৩. খ. অক্সিজেন

প্রযুক্তি কুইজ ৭৪-এর উত্তর
১. গ. গুগল
২. খ) স্কয়ার ও প্যাটার্ন
৩. খ. প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ

বিজ্ঞানচিন্তার গ্রাহক হোন



এক বছর বা ছয় মাসের গ্রাহক হয়ে
ঘরে বসেই
সংগ্রহ করুন
বিজ্ঞানচিন্তা

গ্রাহক হতে ফোন করুন
নিচের নম্বরে
০১৭০৮৪১১৯৯৬

ডেলিভারি চার্জ ছাড়া ঘরে বসে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন :
prothoma.com
বিজ্ঞানচিন্তা

বিজ্ঞানচিন্তার জুন সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

গত সংখ্যার সব বিভাগের কুইজের উত্তর অনেকেরই সঠিক হয়েছে। তবে লটারির মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে ১৫ জন বিজয়ীকে বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ৩০০ টাকার বই। বিজয়ীদের অভিনন্দন।

সৌজন্যে অন্যধারা বিজ্ঞানবাক্স বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স কিট

রসায়ন কুইজ ১০২
ওমর জাহী
কদমতলি, ঢাকা

তুর্যয় পাল
জগন্নাথপুর কুমিল্লা

ফারহানা ইসলাম
পাইকগাছা, খুলনা

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০২
মোঃ সামিন ইয়াসার
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

আয়শা হক
উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা

রুবায়েত হাসান
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০২
ফাতেমা আক্তার উপমা
জয়দেবপুর, গাজীপুর

নাসরিন আক্তার
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

আব্দুল মান্নান
পুঠিয়া, রাজশাহী

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০২
হুমায়রা আক্তার
মিঠাপুকুর রংপুর

শিরীন আখতার
রূপসা, খুলনা

আবু তাহের
কলারোয়া, সাতক্ষীরা

প্রযুক্তি কুইজ ৭৪
তানজিম আহমেদ
সিদ্ধিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সেলিম মোহাম্মদ আব্দুন নাইম
বটতলী, দিনাজপুর সদর

নাজমুল হক রিমন
বিবির বাগিচা, যাত্রাবাড়ি



Job Solution BD
Click Here to join the Channel

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD

Job Solution BD
Click Here to join the Channel

BIGGANCHINTA July 2025 Regd, DA 6410, Year 9 Issue 10, Tk. 50



মমতায় বাড়াই সম্পর্কের গভীরতা

৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কগুলোকে মমতায় ঘিরে রেখেছে তীর।
তাইতো সরিষার তেল থেকে শুরু করে রেডি মিক্স পর্যন্ত সবকিছুতেই
বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কখনোই আপস করেনি তীর।

ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন
www.citygroup.com.bd /TEER1972

Click & join here for more update->https://t.me/job_solutionBD